পুতুলের মতো মেয়ে

প্রণব ভট্ট

অনন্যা পড়ি কি মরি করে যখন চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে এসে পৌঁছায়, তখন সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের গার্ড তার সংকেত সবুজ পতাকা দুলিয়ে ফেলেছেন, ড্রাইভারও সবুজ সংকেত পেয়ে যথারীতি আস্তে আস্তে ট্রেন চালানো শুরু করে দিয়েছে। ট্রেনটাও অজগরের মতো চলতে শুরু করে দিয়েছে। সুলভ শ্রেণীর একটা টিকেট আগেই কাটা ছিল। সব সময় ব্যবহার করা ভ্যানিটি ব্যাগটা ছাড়াও হাতে আরো দুটো মাঝারি সাইজের ব্যাগ, যাতে নিজের কাপড়-চোপড়, বইপত্র, এটা-সেটা। ট্রেন চলতে শুরু করেছে দেখেই ব্যাগ দুটোকে কোনোমতে টেনেহিঁচড়ে বগলদাবা করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে অনন্যা। হাঁপাতে হাঁপাতে প্লাটফরমের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে শেষমেশ চলন্ত ট্রেনটার নাগালও পায় এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কসরতের পর কোনোমতে তাতে ওঠে ও। এত জোরে ছুটলে যা হয়, ট্রেনের কামরায় উঠেও হাঁপাতে থাকে, চোখ বন্ধ করে প্রচণ্ড রকম হাঁপাতে থাকে। চারদিকে একবার যে তাকিয়ে দেখবে তাও আর পারে না।

‘দেখুন, এটা কিন্তু এসি কম্পার্টমেন্ট।’

কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে তাকায় অনন্যা। মাঝারি সাইজের এসি কামরা। কামরায় কথা বলা এই এক ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউ নেই। তখনো হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই ভদ্রলোকের দিকে ভালো করে এবার তাকায়। দেখতে-শুনতে স্মার্ট, কেতাদুরস্ত, গায়ের রঙ শ্যামলা, চোখে দামি সোনালি ফ্রেমের চশমা, চশমার ওপাশে বড় বড় দুটো চোখ, সপ্রতিভ জ্বলজ্বলে চোখ, ব্যাকব্রাশ চুল, পরনে বেশ দামি ইংলিশ স্যুট এবং সঙ্গে রঙ ম্যাচ করা মানানসই টাই। প্রায় ছয় ফুট উচ্চতার পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষটার দিকে তাকিয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরার এক কোণে আরো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায় অনন্যা।

‘এই যে, আমার কথা শুনতে পাননি আপনি?’

মাথা নিচু করে কোনোমতে বলে অনন্যা, ‘জি, পেয়েছি।’

‘তো চুপ করে আছেন যে?’

‘আমার কাছে টিকেট আছে।’ অনন্যা কোনোমতে বলে, ‘তবে সেটা সুলভ শ্রেণীর।’

‘জানি।’

‘জানি’ শুনেই চকিতে মুখ তুলে তাকায় অনন্যা। ‘জানেন ?’

ভদ্রলোক আবার বলেন, ‘জি, জানি।’

অবাক না হয়ে পারে না। ‘কী করে জানেন !’

মিষ্টি হাসেন ভদ্রলোক। ‘প্রথমত, এই কম্পার্টমেন্ট পুরোটাই আমার রিজার্ভ করা, এখানে আর কারো টিকেট থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, আপনাকে দেখে এটা অন্তত বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, আপনি ভদ্রলোকের মেয়ে, কিছুতেই টিকেট ছাড়া ট্রেনে ওঠেননি আপনি। আর...’

‘আর’ পর্যন্ত বলে আর বলেন না, থেমে যান ভদ্রলোক।

লোকটাকে কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখেই অনন্যা বলে, ‘কী হলো, থেমে গেলেন যে ! আর কী, বলুন !’

‘আপনাকে দেখে আরো একটা কথা বুঝতে পেরেছি।’

অনন্যা দেরি করে না, বলে, ‘কী ?’

‘আপনি ছাত্রী।’

লোকটার আইকিউ দেখে বিস্মিত হয়ে যায় অনন্যা। মাথা নিচু করে ছিল, ভদ্রলোকের মুখে ‘আপনি ছাত্রী’ শুনে আবার মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকায়।

‘আপনি ছাত্রী, এটা কী করে বললাম, তাই না ?’ ভদ্রলোক হাসেন, মিষ্টি হেসে বলেন।

‘আমিও তো তা-ই ভাবছি। আমি যে পড়ি, মানে ছাত্রী, আপনি কী করে বুঝলেন, বলুন তো ?’

‘শুধু ছাত্রী নন, আপনি যে মেডিকেলের ছাত্রী এটাও হলফ করে বলতে পারি আমি।’

‘কী করে জানেন আপনি !’ যেন থ হয়ে যায়, একেবারে থ হয়ে যায় অনন্যা। ‘কী করে জানেন আপনি, বলুন তো !’

‘কী করে জানি, সেটা না হয় পরে বলব।’ ভদ্রলোক হাসেন। ‘আগে বলুন, আমি যা বলেছি সেটা ঠিক কি না।’

‘ঠিক, ঠিক, একশবার ঠিক।’ অনন্যা ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। ‘জি, আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ি। আচ্ছা...’

অনন্যাকে ‘আচ্ছা’ বলে থেমে যেতে দেখে মিষ্টি হাসেন ভদ্রলোক। ‘কী হলো, থেমে গেলেন কেন ? আচ্ছা কী, বলুন ?’

‘আপনি কি জ্যোতিষী ?’ অনন্যা আমতা আমতা করে বলে, ‘মানে বলছিলাম কি, আপনি কি জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করেন ?’

ভদ্রলোক হাসেন। ‘না।’

‘তো ঠিক ঠিক সব কী করে বলছেন, বলুন তো !’

‘বলব ?’

‘হ্যাঁ, বলুন।’

‘বলব, তবে তার আগে দয়া করে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে যে।’

অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। ‘কী কাজ !’

ভদ্রলোক হাসেন, মিষ্টি হেসে বলেন, ‘বুঝতে পারছেন না ?’

অনন্যা মাথা নাড়ে। ‘না তো !’

‘আমি বসে আছি, বসে আছি মানে ট্রেনের কামরার নরম গদিতে যাকে বলে আরামসে বসে আছি।’ ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে তার কেতাদুরস্ত মুখে সুন্দর করে হাসেন। ‘আর আপনি ? আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। না না, এ ঠিক হচ্ছে না, একদম ঠিক হচ্ছে না।’

‘কিন্তু আমি তো...’

কথা শেষ করতে দেন না অনন্যাকে, থামিয়ে দেন। ‘একটা প্রশ্ন করব ?’

অনন্যাও দেরি করে না, বলে, ‘বলুন।’

‘আমার এখন বয়স কত হবে বলে মনে হয় আপনার ?’

অনন্যা ভদ্রলোককে আর একবার দেখে, দেখে বলে, ‘পঞ্চাশ।’

ভদ্রলোক হাসেন, হেসে বলেন, ‘তেপ্পান্ন। আপনি তো মেডিকেলে পড়েন, মানে ছাত্রী, আপনার বয়স যদি বিশ-বাইশ হয়, আমার যা বয়স তাতে আমি নিশ্চয়ই আপনার বাবার মতো, মানে বাবার বয়সী। সেই বাবার বয়সী একজন এভাবে অনুরোধ করার পরও বসবেন না আপনি, বলুন ?’

ভদ্রলোককে খারাপ তো নয়ই বরং আস্তে আস্তে ভালো লাগতে শুরু করেছে এটা বুঝতে পারে অনন্যা। সেও তাই হাসে। ‘বসতে পারি, নিশ্চয়ই বসতে পারি, তবে এক শর্তে।’

‘শর্ত !’ অনন্যার মুখে শর্তের কথা শুনে ভদ্রলোক বলেন, ‘কী শর্ত, বলুন ?’

‘ঠিক আছে, তো আপনিই বলুন, বাবার বয়সী বা বাবার মতো কেউ তাদের মেয়ের বয়সী বা মেয়ের মতো কাউকে আপনি করে বলেন ?’ অনন্যা হাসে, মিষ্টি হাসে। ‘কী হলো, বলুন, জলদি বলুন ?’

‘না, বলে না।’

‘ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক বলেছেন।’ অনন্যা হাসে। ‘তো এই যে বেঠিক কাজটা আপনি করে যাচ্ছেন, মানে আমাকে তুমি সম্বোধন না করে আপনি সম্বোধন করা, এটা কি ঠিক হচ্ছে আপনার ?’

এবার আর নিঃশব্দে নয়, একটু শব্দ করেই হাসেন ভদ্রলোক। ‘না, অন্যায় হচ্ছে, খুব অন্যায় হচ্ছে, ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে।’

ভদ্রলোককে হাসতে দেখে অনন্যাও হাসে, হেসে বলে, ‘অন্যায় জেনেও এই অন্যায়টা আপনি অনবরত করে যাবেন, আর আমি অন্যায় দেখেও প্রতিবাদ করব না, মুখ বুজে থাকব, না ?’

‘তুমি বলতে হবে, এই তো ?’

‘এরপরও জিজ্ঞেস করছেন, বলতে হবে কি না !’ অনন্যা এবার আর হাসে না, ইচ্ছে করেই মুখচোখ সব গম্ভীর করে রাখে। ‘বলতে হবে মানে, একশবার বলতে হবে, হাজারবার বলতে হবে। না বললে ছাড়বই না আমি।’

‘ঠিক আছে, বলছি।’ ভদ্রলোক হাসেন, হেসে বলেন, ‘এবার বসুন তো, বসুন আপনি।’

‘নাহ্, হলো না। বসুন নয়, আপনি নয়।’ অনন্যা হাসে। এবার আর নিঃশব্দে নয়, সামান্য হলেও শব্দ করে হাসে সে। ‘বসো তো, বসো তুমি হবে, বুঝেছেন ?’

‘বেশ তো, বসো, বসো তুমি।’

অনন্যা আর কথা বাড়ায় না। বসে। মুখোমুখি বসেই বলে, ‘এবার বলুন, সাফ সাফ সব বলুন, মানে খুলে বলুন।’

‘খুলে বলব !’ ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকান। ‘কী খুলে বলব !’

‘আপনি জ্যোতিষী কি না আগে বলুন।’

‘না।’

‘জ্যাতিষী না !’ অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। ‘তাহলে আমার সম্পর্কে এত কিছু কী করে ঠিক ঠিক বলছেন আপনি !’

‘তোমার নাম অনন্যা, মানে অনন্যা রহমান, না ?’

‘জি, অনন্যা। আমার নাম অনন্যা রহমান।’ ভদ্রলোককে তার নাম বলতে দেখে একেবারে হতবাক হয়ে যায় অনন্যা। ‘আরে, আমার তো মাথাটাথা সব খারাপ হয়ে যাবে দেখছি। কী করে বলছেন ! কী করে আমার সম্পর্কে সব নির্ভুল বলছেন আপনি, বলুন তো !’

‘কী করে বলছি ?’

‘হ্যাঁ, কী করে এভাবে ঠিক ঠিক সব বলছেন। আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখাই হয়নি, চিনিও না আমি আপনাকে।’ অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। ‘তারপরও আমি কী পড়ি, কোথায় পড়ি, আমার নাম, সব কী করে জানেন আপনি ! মাথামুণ্ডু আমি তো কিছুই বুঝতে পরছি না ! আচ্ছা, আপনি কি জাদুকর ?’

এবার আর আস্তে নয়, বেশ শব্দ করেই হাসেন ভদ্রলোক। ‘না, আমি জাদুকর নই।’

‘তাহলে ! আমার সম্পর্কে সবই ঠিকমতো কী করে বলছেন আপনি !’ অবাক হয়ে তাকায় অনন্যা। ‘আচ্ছা, আমাকে কি কখনো দেখেছেন আপনি ?’

‘না তো !’

‘চেনেন ?’

‘না দেখলে চিনব কী করে ?’

‘তাহলে !’ অবাক হয়ে তাকায় অনন্যা। ‘সবকিছু একেবারে ঠিক ঠিক কী করে বলছেন আপনি ! আরে, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘বলব ?’

‘হ্যাঁ, বলুন।’

‘তুমি যখন হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনে উঠছিলে, তখন তোমার যে কোনো একটা ব্যাগ থেকে একটা মেডিকেল জার্নাল পড়ে গেছে। ওই দেখো, ওটা এখনো টয়লেটের সামনেই পড়ে আছে।’

ভদ্রলোক থামেন। ভদ্রলোক থামতেই অনন্যা বলে, ‘মেডিকেল জার্নাল পড়ে থাকার সঙ্গে আমার সম্পর্কে সবকিছু ঠিক ঠিক বলতে পারার কী সম্পর্ক, বুঝতে পালাম না তো !’

ভদ্রলোক হাসেন, মিষ্টি হেসে বলেন, 'আছে, সম্পর্ক আছে।'

অনন্যার যেন ত্বর সয় না, সে আবারও বলে, 'কী সম্পর্ক, বলুন ?'

ভদ্রলোক টয়লেটের সামনে পড়ে থাকা মেডিকেল জার্নালটা দেখিয়ে বলেন, 'জার্নালটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো না একবার, দেখো।'

অনন্যা ভদ্রলোকের কথার কিছুই বুঝতে পারে না। সে তাই বলে, 'আমারই মেডিকেল জার্নাল তো। কী দেখব ওতে !'

'ওতে তোমার নাম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, থার্ড ইয়ার লেখা আছে। কী, ঠিক বলিনি আমি, বলো ?'

'হ্যাঁ, আছে তো।' ভদ্রলোকের আইকিউ দেখে অনন্যা এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, ভদ্রলোকের মুখের দিকে কেবল অপলক তাকিয়ে থাকে।

ভদ্রলোক হাসেন। 'এবার বলো, আমি জ্যোতিষী ?'

অনন্যা না-সূচক মাথা নাড়ে।

'জাদুকর ?'

অনন্যা আবারও একই রকম মাথা নাড়ে।

'আমাকে দেখে, আমার কথা শুনে তুমি অবাক হয়েছ, তাই না ?'

অনন্যা তখন এতটাই হতবিহ্বল যে, মানুষটাকে বারবার কেবল দেখে, কিছুই বলে না।

'কী হলো, বললে না, আমাকে দেখে তুমি খুব অবাক হয়েছ, না ?'

এবার আর চুপ থাকে না, অস্ফুট স্বরে বলে, 'হুঁ।'

'এবার কাজের কথায় আসি।'

'কাজের কথা !' চকিতে তাকায় অনন্যা। 'কী কাজের কথা, বলুন ?'

'কাজের কথা হচ্ছে, এবার তোমার সম্পর্কে বলো।' ভদ্রলোক অনন্যার দিকে তাকায়। 'বলো মানে, বিস্তারিত বলো।'

'কী বলব ?'

'তোমার আর কে কে আছেন, বলো।'

'মা।' অনন্যা বলে, 'এই দুনিয়ায় ভাই বলুন, বন্ধু বলুন, ওই এক মা-ই আছে আমার।'

'বাবা ?'

অনন্যা মাথা নেড়ে বলে, 'নেই।'

'নেই মানে !' নেই কথাটা বুঝতে পারেন না ভদ্রলোক। 'নেই মানে, কোথায় গেছেন ?'

'যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।'

অনন্যার কথা বুঝতে পারেন না ভদ্রলোক, তাই বলেন, 'তোমার কথা কিন্তু বুঝতে পারলাম না আমি। উনি কোথায় গেছেন, বলো তো ?'

‘আমার জন্মের ক মাস পরই হার্ট অ্যাটাকে বাবা...’

আর বলতে পারে না, থেমে যায় অনন্যা। অনন্যাকে থেমে যেতে দেখেই ভদ্রলোক বলেন, ‘তোমার বাবার কোনো স্মৃতি তো তাহলে...’

‘না, নেই।’ অনন্যা বলে, ‘বাবার কোনো স্মৃতিই আমার মধ্যে নেই।’

‘আর কেউ নেই?’

অনন্যা মাথা নাড়ে। ‘না, নেই।’

‘ভাইবোন কেউ নেই?’

‘না।’ অনন্যা বলে, ‘আমি আমার বাবা-মার প্রথম সন্তান। আমার জন্মের ক মাস পরই বাবা মারা যান।’

সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন পাহাড়তলি ছাড়িয়ে ভাটিয়ারি হয়ে বাড়বকুণ্ড ছাড়িয়ে সীতাকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলে। অনন্যার এ কথার পর ভদ্রলোক খানিকক্ষণ কিছু বলেন না। দুজনের মাঝখানে ট্রেনের গড়গড় শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই থাকে না।

‘অনন্যা।’ খানিকক্ষণ চুপ থেকে ভদ্রলোক আবার বলেন।

কাচের জানালায় চোখ রেখে অনন্যা বলে, ‘বলুন।’

‘বাবার কথা বলে মন খারাপ করে দিলাম, না?’

‘কোনো স্মৃতি নেই। তবু বাবা তো, মন খারাপ হয়ে যায়।’ অনন্যা বিষণ্ন তাকিয়ে বলে, ‘কলেজে কারো বাবা যখন দেখা করতে আসেন তাদের মেয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, আমার ইদানীং খুব কষ্ট হয়, জানেন? আচ্ছা...’

‘আচ্ছা’ বলেই অনন্যাকে থেমে যেতে দেখে ভদ্রলোক বলেন, ‘কী হলো, থেমে গেলে যে?’

‘আচ্ছা সব বাবাই তাদের মেয়েকে খুব ভালোবাসেন, না?’

‘কী বলছ! বাবা তার মেয়েকে ভালোবাসবেন না!’

ট্রেন এগিয়ে চলে। আবারও কেউ কিছু বলে না, আবারও দুজনের মাঝখানে চলন্ত ট্রেনের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ থাকে না।

খানিকক্ষণ পর ভদ্রলোকই মুখ খোলেন। ‘অনন্যা, এই অনন্যা।’

‘বলুন।’

‘আমার সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করে না তোমার?’ ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখ করে বলেন, ‘এই ধরো, কে আমি, কোথায় থাকি, স্ত্রী-পুত্র কে কোথায় আছে আমার, এসব জানতে ইচ্ছে করে না?’

এতক্ষণ চলন্ত ট্রেনের কাচের জানালা দিয়ে বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অবারিত ধানক্ষেত, সবুজ মাঠ, এটা-ওটা দেখছিল। এবার মাথা ঘুরিয়ে তাকায়, তাকিয়ে বলে, ‘আপনি কী করেন?’

‘আমি কী করি তা বলার আগে আমার কী নাম সেটা বলি, কেমন?’

অনন্যা বলে, ‘বেশ তো, বলুন।’

‘আমার নাম আবুল হাসান। ডাকনামও অবশ্য একটা আছে। সেটা অবশ্য কেউ জানে না।’

‘কী নাম?’

‘কেউ যখন জানে না, তুমিও নাহয় না-ই জানলে নামটা।’ আবুল হাসান হাসেন। ‘মা-বাবা অবশ্য ও নামেই ডাকতেন। আর একজনও অবশ্য ডাকনামটা জানত, ডাকতও। আর কেউ অবশ্য জানেও না, ডাকেও না। আমার যে ডাকনাম আছে, জানেই তো না, কী করে ডাকবে, বলো ?’

‘আর একজন ডাকনামে ডাকত বলছেন।’ অনন্যা আবুল হাসানের মুখের দিকে তাকায়। ‘ডাকত বলছেন কেন, বলুন তো ? তার মানে, উনি কি এখন নেই ?’

‘না।’

‘তা উনি কে ?’

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু হলেও দেরি করে, একটু হলেও ভাবে। তারপর বলে, ‘থাক না সে কথা।’

‘কেন ! থাকবে কেন ?’

অস্ফুট স্বরে আবুল হাসান বলেন, ‘আমার স্ত্রী।’

‘আপনার স্ত্রী !’

‘হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।’

অনন্যা দেরি করে না, বলে, ‘কোথায় গেছেন উনি ?’

‘না, মারা যায়নি।’ আবুল হাসান আনমনা বলেন, ‘আছে, বেঁচে আছে।’

অনন্যার যেন ত্বর সয় না, সে আবারও বলে, ‘তা কোথায় গেছেন উনি ?’

আবুল হাসান বিষণ্ন দু চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, ‘জানি না।’

‘কেন, জানেন না কেন ?’ অনন্যা বলে, ‘আপনার স্ত্রী, অথচ উনি কোথায় গেছেন আপনি জানেন না, এ কেমন কথা !’

কথা শেষ করতে দেন না অনন্যাকে, আবুল হাসান বলেন, ‘ও কথা থাক। আমি কোথায় থাকি, বলি ?’

‘কোথায় থাকেন ?’

‘ঢাকায়।’ আবুল হাসান বলেন, ‘বনানীতে সুন্দর একটা বাড়ি আছে আমার। ছবির মতো সাজানো-গোছানো এক ইউনিটের দোতলা বাড়ি। কিন্তু...’

‘কিন্তু’ পর্যন্ত বলেই আর বলতে পারেন না, থেমে যান আবুল হাসান। থেমে যান মানে, অনেকক্ষণ যে থেমে থাকেন তাও নয়। খানিক থেমে আবার বলেন, ‘কিন্তু আমার ওই বাড়িতে কী আছে, কী নেই, জানো অনন্যা ?’

অনন্যা বলে, ‘বলুন ?’

তীরবেগে ছুটে চলা সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে আবুল হাসান বলেন, ‘আমার সাজানো-গোছানো বনানীর বাড়িতে সবই আছে, সব। কিন্তু তারপরও শূন্য, পুরো বাড়িটাই শূন্য।’

আবুল হাসানের কথা বোঝার কথা নয়, বুঝতে পারেও না অনন্যা। সে তাই বলে, ‘কেন ? সবই আছে, তারপরও শূন্য বলছেন কেন ? আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আবার কী কথা ! একদিকে বলছেন সবই আছে, অন্যদিকে বলছেন শূন্য, এ কেমন কথা, বলুন তো !’

‘অনন্যা !’

‘বলুন।’

বিষণ্ন দু চোখে অনন্যার দিকে তাকান আবুল হোসেন। ‘ঘর আছে, ঘরে থরে থরে সাজানো বিলাস সামগ্রী সব আছে। কিন্তু ঘর আলো করে যার থাকার কথা সে-ই নেই, জানো ?’

‘কে ? কার কথা বলছেন আপনি ? আপনার স্ত্রী ?’

আবুল হাসান অস্ফুট স্বরে বলেন, ‘হুঁ।’

অনন্যা কিছুই বুঝতে পারে না, তাই বলে, ‘একটা কথা বলব ?’

‘বলো।’

‘উনি কি আর আসবেন না ?’

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেরি করেন না, ভাবেন না, আবুল হাসান বলেন, ‘না।’

আবুল হাসানের কথা তখনো বুঝতে পারে না অনন্যা। ‘আসবেন না, কী বলছেন আপনি ! তার মানে, কখনোই কি আর আসবেন না !’

আবুল হাসান এবারও একই জবাব দেন, ‘না, আসবে না। কখনো না, কোনো দিন না।’

‘আপনি ওনাকে খুব ভালোবাসতেন, তাই না ?’

‘হুঁ, বাসতাম।’ আবুল হাসান অনন্যার দিকে নয়, এদিক-ওদিক তাকান। ‘বাসতাম মানে, খুব ভালোবাসতাম, জানো ?’

আবুল হাসানের কথা এবারও মাথায় ঢোকে না অনন্যার।‘বাসতাম মানে, এখন বাসেন না ?’

আবুল হাসান অস্ফুট বলেন, ‘কে জানে, হয়তো বাসি, হয়তো বাসি না।’

‘কিন্তু কেন ?’ অনন্যা বলে, ‘আগে ভালোবাসতেন, কিন্তু এখন...’

অনন্যাকে কথা শেষ করতে দেন না, থামিয়ে দিয়ে আবুল হাসান বলেন, ‘এখন ভালোবাসি কি না জানি না।’

অনন্যা কিন্তু থামে না, সে আবারও বলে, ‘কিন্তু কেন ?’

‘শুনবে ?’

‘বলুন।’

‘কিন্তু শুনতে তোমার ভালো লাগবে না যে !’

‘তবু আপনি বলুন, আমি শুনব। যত কষ্টেরই হোক, দুঃখেরই হোক, আমি শুনব।’

‘এ আমার বড় লজ্জার গল্প, হেরে যাওয়ার গল্প। কেন শুনতে চাইছ তুমি অনন্যা ?’ বিষণ্ন দু চোখে আবুল হাসান কেমন যেন তাকান। ‘তোমার শুনতে কষ্ট হবে কি না জানি না, তবে আমার বলতে কষ্ট হবে, খুব কষ্ট হবে অনন্যা। কারণ...’

‘কারণ’ পর্যন্ত বলে আর বলতে পারেন না, থেমে যান আবুল হাসান। আবুল হাসানকে কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখে অনন্যা বলে, ‘কী হলো, থেমে গেলেন কেন ? কী কারণ, বলুন ?’

‘কারণ, এ আমার পরাজয়ের, গ্লানির, অপমানের গল্প অনন্যা।’ আবুল হাসান এবার আর এদিক-ওদিক নয়, বিষণ্ন দু চোখে অনন্যার দিকে তাকান। ‘এত লজ্জার যে, কাউকে বলি না। বলতে চাইও না। তবে হ্যাঁ,

তোমাকে বলব। কেন বলব, জানো ?'

'কেন ?'

'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে।'

অনন্যা হাসে, হেসে বলে, 'তাই ?'

এক মুহূর্ত দেরি করেন না আবুল হাসান, বলেন, 'হ্যাঁ, তাই। তোমাকে দেখেই কী মনে হচ্ছে, জানো ?'

অনন্যা বলে, 'কী ?'

'মনে হচ্ছে, ইস্, তোমার মতো, ঠিক তোমার মতো যদি একটা মেয়ে থাকত আমার !' একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকান আবুল হাসান। 'তাহলে কী হতো, বলব ?'

'বলুন।'

'এত সম্পদ, এত বিত্ত, এত ব্যবসা নিয়েও আমি আজ এতটাই রিক্ত হয়ে যেতাম না।'

'ধ্যাৎ, আপনি রিক্ত নাকি !' অনন্যা হাসে। 'এত ব্যবসা-বাণিজ্য টাকা-পয়সা থাকার পরও নিজেকে রিক্ত বলছেন কেন আপনি ? আরে, বললেই হলো আপনি রিক্ত, না ?'

আবুল হাসান ম্লান হাসেন। 'তুমি জানো না, কিচ্ছু জানো না তুমি।'

'তাই ?'

আবুল হাসান বলেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

আবার কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলে না। ট্রেন দ্রুত ছুটে চলে। সুবর্ণ এক্সপ্রেস কখন ফেনী হয়ে লাকসাম ছাড়িয়ে যায়, দু জনের কেউ বলতেও পারবে না।

'এই নাও, আমার কার্ড।' খানিক চুপ করে থেকে আবুল হাসান বলেন, 'এতে আমার বাড়ি ও অফিসের ঠিকানা আছে। কেন লেগেছে জানি না, তবে তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি তো, তাই মানুষকে আমার ইদানীং আর এত তাড়াতাড়ি ভালো লাগে না, জানো ?'

'আমারও লেগেছে।' অনন্যা হেসে বলে, 'বিশ্বাস করুন আপনি, আপনাকেও খুব ভালো লেগেছে আমার।'

আবুল হাসানও আর বিষণ্ন থাকেন না, হাসেন। 'কিন্তু হঠাৎ করে তোমাকে আমার এত ভালো লেগেছে কেন, বলতে পারো ?'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'জানি, জানি।'

'তো বলো।'

'আপনার একটা মেয়ে নেই যে।'

চোখমুখ সব খুশিতে ভরে যায়, অন্তহীন খুশিতে আবুল হাসান খানিক হেসে বলেন, 'জানো, এ পরীক্ষায় তুমি কত পেয়েছ ?'

অনন্যা বলে, 'কত ?'

'একশতে একশ।'

অনন্যার যেন ত্বর সয় না, সে আবারও বলে, 'তো বলুন, এবার আপনার হেরে যাওয়ার গল্প বলুন।'

‘কাউকে বলা হয়নি যে গল্পটা, হ্যাঁ, সে গল্পটা বলব, তোমাকেই বলব।’ আবুল হাসান মিষ্টি হেসে তাকান। ‘তোমাকে দেখে, কথা বলে, গল্প করে মনটা ভরে গেছে আমার, জানো ? বলতে গিয়ে যদি মনটা খারাপ হয়ে যায়, যদি কেঁদে ফেলি, তাই আজ থাক অনন্যা। অন্য একদিন না হয় বলব, সব খুলে বলব।’

কী ভেবে অনন্যা আর এ প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে নিজের সঙ্গে আনা একটা ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা হটপট বের করে বলে, ‘এবার একটা কথা বলি ?’

‘বলো।’

‘আমাকে আপনার ভালো লেগেছে, ঠিক তো ?’

‘ঠিক, একশবার ঠিক, হাজারবার ঠিক।’

‘আপনি তো বড়লোক, খুব বড়লোক।’ অনন্যা বলে, ‘মা যত্ন করে লুচি আর মাংস রেঁধে দিয়েছেন, খাবেন তো আমার সঙ্গে ? নাকি গরিব বলে...’

‘কী যে বলো না, তার ঠিক নেই।’ কথা শেষও করতে দেন না অনন্যাকে, আবুল হাসান বাধা দেন। বাধা দিয়ে বলেন, ‘তুমি আমার যাকে বলে মেয়ের মতো, তোমার সঙ্গে খাব না তো কার সাঙ্গে খাব, বলো তো ?’

‘খাবেন !’ খুশির যেন কোনো সীমা থাকে না অনন্যার। ‘সত্যি খাবেন আপনি ?’

‘এই, তুমি কেমন মেয়ে, বলো তো ! কেমন মেয়ে তুমি !’

অনন্যা অবাক হয়ে বলে, ‘কেন ?’

আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, ‘কেবল খাব কি না প্রশ্ন করছ, কিন্তু খেতে দিচ্ছ না !’

আবুল হাসানের কথা শুনে অনন্যা দ্রুত হটপট খুলে সঙ্গে আনা একটা কাচের প্লেট মুছে তাতে লুচি-মাংস ঢেলে দেয়। আবুল হাসানকে কিন্তু বলতেও হয় না, তিনি প্লেট টেনে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে থাকেন।

আর দেরি করে না, অনন্যা চোখ বড় বড় করে বলে, ‘আরে ধ্যাৎ, আপনি একাই সব খেয়ে ফেলবেন নাকি, বলুন তো ?’

খেতে খেতেই আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলে, ‘তুমিও খাবে ?’

অনন্যাও হাসে। ‘বা রে, আমার খাবার আপনাকে দিলাম, আর আমাকেই কিনা বাদ দিয়ে দিলেন আপনি !’

‘পেটুক, বুঝেছ ? আমি হচ্ছি গিয়ে একটা আস্ত পেটুক।’ আবুল হাসান খেতে খেতে বলেন, ‘নাও মা, এই নাও, তুমিও খাও।’

আবুল হাসানের মুখে ‘মা’ ডাক শুনেই চমকে তাকায় অনন্যা। ‘আমাকে মা বললেন !’

‘হ্যাঁ, বললাম। মাকে মা বলব না তো কী বলব !’ আবুল হাসান খেতে খেতেও অমায়িক হাসেন। ‘এখন খাও তো, খাও।’

অনন্যা আর কথা বাড়ায় না, সেও নেয়। একই প্লেটে দুজনই খায়। খায় মানে, কাড়াকাড়ি করে খায়। ট্রেন ছুটে চলে কুমিল্লা পেরিয়ে, আখাউড়া পেরিয়ে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পেরিয়ে ঢাকার দিকে।

২

এই এক অভ্যাস শামীমের, সময় পেলেই লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ে সে। কখনো দাউদকান্দি ছাড়িয়ে কুমিল্লার

ময়নামতি, কখনো সাভার কিংবা সাভার ছাড়িয়ে, কখনোবা জয়দেবপুর বা আরো বহু দূরে পর্যন্ত চলে যায়। কখনো ধানক্ষেতের আল ধরে হাঁটে, কখনো নির্জনে একা বসে থাকে। কখনোবা এদিক-ওদিক ঘোরে, দেখে। পড়াশোনার অবসরে সময় পেলেই আর কোনো কিছু ভাবে না, ছুটে যায়। কিন্তু কেন যায় ? এ প্রশ্নের উত্তর নিজেও কি জানে শামীম ? না, জানে না। তবে এটা ঠিক, ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে, তাই যায়। এই যে ঘুরে বেড়ানোর নেশা বা শখ– কখন হয়েছে, কীভাবে হয়েছে বলতেও পারবে না শামীম। তবে এখানে-ওখানে যেতে, ঘুরতে, গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন ঘুরে বেড়াতে, সবুজের সামনে, অবারিত ধানক্ষেতের সামনে, দিগন্তের সামনে, যেদিকে দু চোখ যায় নীল আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে যে তার ভালো লাগে, এটা সে নিজেও যেমন জানে, বন্ধুরা, চেনাজানা, ঘনিষ্ঠরাও তা ভালো করেই জানে।

বাবা ক' বছর আগে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর এক সন্ধ্যায় গাড়ির চাবিটা হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'বেড়াতে তোমার খুব শখ, তাই নতুন গাড়িটা কিনে দিলাম। এখন থেকে আমার কাছে আর তোমার যখন-তখন গাড়ি চাইতে হবে না। ভালো হলো না, বলো ?'

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার পর কিংবা ঈদের দিন ছাড়া যা কখনোই করেনি শামীম, চাবিটা হাতে নিয়ে সেদিন তা-ই করে বসে সে। টুপ করে বাবার পা ছুঁয়ে সালাম করে। সালাম করে একগাল হেসে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ বাবা, থ্যাঙ্ক ইউ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ !'

'হ্যাঁ বাবা, তোমাকে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্।'

'তুমি কিন্তু ভুল করলে।'

'ভুল !'

'হ্যাঁ, ভুল।'

'কী ভুল, বলো ?'

'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালোবাসার, শুধুই ভালোবাসার, গভীর ভালোবাসার। তোমার জন্যে আমি করব, এটাই তো নিয়ম। এখানে ধন্যবাদের প্রশ্ন আসছে কেন ?'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেদিন 'স্যরি, ভেরি স্যরি বাবা' বলতে একটুও দেরি করেনি।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আচ্ছা, পৃথিবীর সব বাবাই কি তাদের সন্তান এত ভালোবাসে ! এত ! শামীম পৃথিবীর তাবৎ বাবা সম্পর্কে জানে না। তবে এটা সে জানে, তার বাবা তাকে শুধু ভালোবাসেন না, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। ভালোবাসবেনই না কেন ? সে ছাড়া আর কে আছে তার ? মা তো সেই কবেই তাকে ছেড়ে চলে গেছেন ! এই দুনিয়ায় মানুষটার প্রিয়জন বলতে, সন্তান বলতে, বন্ধু বলতে আজ তো সে-ই।

অনেক রাত পর্যন্ত একা দোতলায় শোবার ঘরের বারান্দায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। প্রায়ই রাত পেরিয়ে যায়, ভোরও হয়। তারপর একটু বিছানায় যান, ঘুমান। অন্ধকারের দিকে বিষণ্ন তাকিয়ে থেকে রাতভর কী যে ভাবেন তিনিই জানেন ! নিজের ফেলে আসা জীবন নিয়ে ভাবেন ? পাওয়া না পাওয়া নিয়ে হিসেব-নিকেশ করেন ? নাকি অন্য কিছু ? তবে একটা জিনিস ঠিকই বুঝতে পারে শামীম, মার এভাবে চলে যাওয়াটাকে আজও মেনে নিতে পারেননি তিনি। হবে হয়তো মার এভাবে চলে যাওয়াটায় ভেতরটা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তার, দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। মানুষটাকে দেখে কষ্ট হয় শামীমের, খুব কষ্ট হয়। বড় নিঃস্বের মতো দু চোখে সর্বস্ব হারানোর বেদনা মেখে মাঝে মাঝে তার দিকে কেমন যেন তাকায়।

একদিনকার কথা আজও মনে আছে তার। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে যখন বাবার কাছে এসে দাঁড়ায়, পা

ছুঁয়ে সালাম করে সুসংবাদটা জানায়, তখন এত খুশিতে হো-হো করে হাসার বদলে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। অশ্রুপ্লুত চোখে পরম স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'একটা কথা বলব বাবা তোমাকে ?'

শামীম ভাবেনি, দেরিও করেনি, বলেছে, 'বলো বাবা।'

'তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই বাবা, কেউ নেই।'

শামীম এবারও দেরি করে না, বলে, 'জানি বাবা। তা তুমি খুশি হয়েছ তো, বলো ?'

'খুশি বলে খুশি, কী বলছ তুমি ! তোমার খুশিই তো এখন আমার খুশি বাবা।'

মাস্টার্সের রেজাল্টও ওই একই, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। রেজাল্ট পেয়ে প্রথমে বাবার কথাই ভেবেছে শামীম, বাবার মুখটাই সর্বপ্রথম মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে তার। বাড়ি পৌঁছার আগে গাড়িতে বসে একটা কথাই ভেবেছে, আচ্ছা, বাবা কি আজও তাকে দেখে, তার রেজাল্ট শুনে আগের মতো তাকে কাছে টেনে নেবেন ? একই রকম হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবেন ? এসব ভাবতে ভাবতেই বিকেলে বাড়ি ফিরে বাবাকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার সুসংবাদটা জানায়, বাবা বুকেও টেনে নেন, আগের মতো কেঁদেও ফেলেন। কিন্তু আজ আর কিছু বলেন না। কেবল ভেজা চোখে অসহায়ের মতো, কাঙালের মতো তার দিকে তাকান আর চোখ মোছেন।

এত আনন্দে, ফুরফুরে মেজাজে তারপর একটাই কাজ। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' বলে বেরিয়ে পড়া। জয়দেবপুর ন্যাশনাল পার্কের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে নামা, তারপর ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো। এখন জানুয়ারি মাস, শীতকাল, তাই পিকনিকের সিজন। ঢাকা থেকে দলে দলে লোকজনের এখন এখানে পিকনিকে আসার পালা। নির্জন বাড়িতে বাপ-বেটা দুজন মাত্র থাকে বলে কিনা কে জানে, নির্জনতা, একাকিত্ব বড় ভালো লাগে তার। কিন্তু পিকনিকের সিজনে এখানে এত হাউকাউ, হইচইয়ের মধ্যে এসে ভালো লাগা তো দূরের কথা, মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায় শামীমের। কিন্তু এত দূর এসে ফিরে গেলে তো চলবে না। তাই এদিক-ওদিক হাঁটতে হাঁটতে মাইকে হঠাৎ চমৎকার মনকাড়া বাঁশির সুর শুনে থমকে দাঁড়ায়। তাকে যদি কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে, শামীম, তোমার সবচে প্রিয় কী, বলো তো ? তাহলে নির্দ্বিধায় বলবে সে, বেড়ানো, বই পড়া, আর গান শোনা। সময় পেলেই যেমন এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়ে, তেমনি সময় নেই অসময় নেই গল্পের বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা এবং গান শোনাও তার প্রিয়, খুব প্রিয়। তবে হ্যাঁ, গল্পের বই পড়ার ব্যাপারে তার কোনো বাছবিচার নেই। সিরিয়াস প্রবন্ধ, সিরিয়াস উপন্যাস যেমন পড়ে, তেমনি জনপ্রিয় ধারার মনকাড়া উপন্যাসও বেশ পড়ে সে। কবিতাও প্রিয়, বেশ প্রিয়। এও ঠিক, হালকা বইয়ের চেয়ে সিরিয়াস বইয়ের প্রতিই ঝোঁক তার একটু বেশি। গান শোনার ব্যাপারে অবশ্য বেশ বাছবিচার করে সে। রবীন্দ্র, নজরুল, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল তার সবচে প্রিয়। ব্যান্ডসঙ্গীতও কালেভদ্রে শোনে না তা নয়। তবে ব্যান্ডসঙ্গীত, ইংরেজি, ধুমধাড়াক্কা হিন্দি গান কখনো তেমন ভালো লাগে না তার।

ছোটবেলা থেকে গান ভালো লাগে বলেই হয়তো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, এক পা দু পা করে নিজের অজান্তেই একটা চেয়ারে বসে তন্ময় হয়ে চোখ বুজে যে বাঁশি বাজাচ্ছে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ব্যস, দেখেই চমকে ওঠে, ভয়ানক চমকে ওঠে। চোখের যেন পলকই পড়ে না আর। প্রথমত দেখে, যে বাজাচ্ছে সে ছেলে নয়, মেয়ে। দ্বিতীয়ত, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায় রবীন্দ্রসঙ্গীতটা এতই সুন্দর বাজাচ্ছে যে, কেবল মুগ্ধ হয়ে শোনে সে, শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সর্বোপরি একটা কথাই ভাবে, যে বাজাচ্ছে সে মানুষ, নাকি পরী ? এত সুন্দরও হয় কেউ ? না, এর আগে এত সুন্দর নজরকাড়া মুখ আর কখনো দেখেনি শামীম। এত সুন্দর বাঁশিও কি কখনো শুনেছে সে ? উত্তর একটাই, না, শোনেনি। পেছনে একটা ব্যানার টানানো : 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ'। কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শোনে, কতক্ষণ মুগ্ধ দু চোখে তাকিয়ে থাকে বলতেও পারবে না। মাইকে বাঁশির শব্দ থামার পরই খেয়াল হয়।

বাঁশি বাজানো থামিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা।

‘মারভেলাস অনন্যা, মারভেলাস !’ একজন নয়, বেশ কজন বন্ধু আর বান্ধবী ছুটে আসে, ছুটে এসে একসঙ্গে বলে।

অনন্যা কিছু বলে না, কেবল মিষ্টি হাসে।

‘এই, কী করে এত সুন্দর বাজিয়েছিস, বল তো তুই ?’ একজন বলে।

অনন্যা এবারও কিছুই বলে না, কেবল মুচকি হাসে।

‘তোকে যে বিয়ে করবে, সে কোনো হাঙ্কিপাঙ্কি, কোনো ফ্যাচাংই করতে পারবে না তোর সঙ্গে, এ আমি সাফ বলে দিলাম, হুঁ।’ আরেক বান্ধবী বলে।

এবার আর চুপ করে থাকে না, হেসে বলে, ‘কেন ?’

‘বা রে, বাঁশি বাজিয়ে চিৎ করে দিবি যে !’

অনন্যা হাসে। ‘না রে, হলো না, শুধু চিৎ নয়, চিৎ-কাত দুটোই করে দেব।’

অনন্যার কথা শুনে একজন নয়, বেশ ক’জন একসঙ্গে হেসে ওঠে, খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বোকার মতো এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয় ভেবে শামীম আর দাঁড়ায় না, চলে আসে। তাই বলে খালি হাতে আসে না। সঙ্গে নিয়ে আসে এক মধুর স্মৃতি। সে স্মৃতি চমৎকার হলেও, মধুর হলেও, তাড়িয়ে বেড়ায় তাকে। সময় নেই, অসময় নেই, রাত নেই, দিন নেই, সকাল নেই, বিকেল নেই, যেন তাড়িয়ে বেড়ায় তাকে। একটা অপূর্ব বাঁশির সুর, একটা পটে আঁকা ছবির মতো মুখ ভুলতে চায়, কিন্তু পারে না। কানে যেন সেই হৃদয়কাড়া বাঁশির সুর অবিরাম বাজে। হাসিমুখের, বড় মিষ্টিমুখের, পরীর মতো দেখতে মেয়েটা যেন প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে একদম মিশে যায়, একাকার হয়ে যায়। ভুলতে চায়, কিন্তু পারে না। ভাবতে চায় না, তবু ভাবে।

জীবনে তেমন কেউ আসেনি, কাউকে নিয়ে ভাবেওনি। হঠাৎ করেই সুন্দর মুখটাকে দেখা, তার বাঁশি শোনা। ব্যস, একবার দেখে, বাঁশি শুনেই যা হওয়ার তা হয়ে যায়, জীবনের ভিতই যাকে বলে একদম নড়েচড়ে যায়। এমনই অবস্থা হয় যে, রাতদিন সারাক্ষণ একটা কথাই ভাবে। এ ছাড়া যেন আর কোনো ভাবনা নেই, এ ছাড়া যেন কোনো কিছু থাকতেও পারে না। এই যে ভালো লাগা, এই যে রাতদিন এক ভাবাভাবি, এর নামই কি ভালোবাসা ? জানে না শামীম।

দিশেহারার মতো অনন্যা নামের মেয়েটাকে নিয়ে এটা-সেটা ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই ক’দিন পর আবুল হাসান সেদিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘খোকা।’

শামীম দেরি করে না, বলে, ‘বলো বাবা।’

‘তোমার তো এমবিএ করা শেষ।’

‘হ্যাঁ বাবা।’

কাঁটাচামচে ব্রেড-বাটার আর অমলেট কেটে খেতে খেতে আবুল হাসান ছেলের মুখের দিকে তাকান। ‘এবার কী করবে, ভেবেছ কিছু ?’

শামীম আসলে তেমন কিছুই ভাবেনি। ভাববেই বা কী করে ! রেজাল্ট আউটের দিন বিকেলেই তো পুতুলের মতো মুখের, ছবির মতো সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে দেখা, দেখা মানেই তো ঝড় ওঠা, সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাওয়া। সে তাই বলে, ‘না বাবা, এখনো কিছুই ভাবিনি।’

‘পড়তে চাইলে আরো পড়তে পার।’ আবুল হাসান বলেন, ‘আমার আপত্তি নেই।’

শামীম বাবার দিকে তাকায়। 'তুমি কী বলো।'

'আমি ?' আবুল হাসান খেতে খেতেও হাসেন। 'আমি বলি কি, এত বড় ব্যবসা আমার, এবার নাহয় ব্যবসা দেখা শুরু করো।'

'ব্যবসা !'

'হুঁ।'

আবুল হাসানের কথা শুনে শামীম হাসে। 'এখনই !'

'হুঁ, এখনই।' আবুল হাসান ব্রেকফাস্ট শেষ করে অফিসে যাবেন বলে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ান। 'তবে হ্যাঁ, তোমার কোনো চাওয়া কখনো অপূর্ণ রাখিনি আমি। তুমি যদি বাইরে যেতে চাও, আরো পড়তে চাও, পড়বে। এতে আমি আপত্তি করব না। আর হ্যাঁ, শোনো...'

কথার মধ্যেই থেমে যান আবুল হাসান। বাবাকে কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখেই শামীম বাবার মুখের দিকে তাকায়। 'আর কী, বলো বাবা ?'

'তুমি তো মাস্টার্স কমপ্লিট করলে।' আবুল হাসান ছেলের মুখের দিকে তাকান। 'শুধু কমপ্লিট বলি কেন, ভালো রেজাল্টও করলে।'

আবুল হাসান আবারও একটা চেয়ার টেনে বসেন, বসেই বলেন, 'শামীম।'

শামীম বলে, 'বলো বাবা।'

'ভাবছি এ উপলক্ষে বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান করলে কেমন হয় ?'

'অনুষ্ঠান ?' পুরোপুরি শুনেও বাবার কথা শামীম বুঝতে পারে না। 'অনুষ্ঠান কেন বাবা ?'

'বুঝতে পারছ না ?'

'না তো !'

'তুমি শুধু আমার একমাত্র সন্তান নও, একমাত্র ছেলে নও, তুমি আমার পৃথিবী, তুমি আমার সব।' আবুল হাসান সস্নেহে ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি বসা ছেলের দিকে তাকান। 'তুমি শুধু ভালো রেজাল্টই করনি, অনার্সে, মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ। এ কথাটা অনুষ্ঠান করে, ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাতে হবে না সবাইকে ?'

'তাই বলে অনুষ্ঠান ?'

আবুল হাসান দেরি করেন না, বলেন, 'হ্যাঁ, অনুষ্ঠান।'

'কিন্তু বাবা...'

'আরে রাখো তোমার কিন্তু।' আবুল হাসান হাসেন। 'আমার ছেলে দিগ্বিজয় করবে, আর আমি তা জানাব না, না ?'

বাবার কথা শুনে মনপ্রাণ সব ভরে যায় শামীমের। সে তাই হাসে, হেসে বলে, 'তা কবে হবে অনুষ্ঠান ?'

'দেখি।'

'দেখি মানে, দিন-তারিখ এখনো ঠিক হয়নি, না ?'

শামীমের এ প্রশ্নের উত্তরে আবুল হাসান এবার আর কিছু বলেন না। হেসে, মাথা নেড়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়ান।

অফিসে এসেও আজ আর কোনো কিছুতেই মন দিতে পারেন না। দরকারি কয়েকটা ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু একটাতেও সিদ্ধান্ত দেন না, কোনো কিছু লেখেনও না। নিজেকে নিয়ে, নিজের ফেলে আসা সুখ-দুঃখের জীবন নিয়ে ভাবেন তিনি। জীবনে কী পেয়েছেন, পেলে কতটুকু পেয়েছেন তার হিসেব-নিকেশ করেন।

কেন যেন আজ একজনের কথাই মনে পড়ে। একটা মুখ, সুন্দর মুখই মানসপটে ভেসে ওঠে। কেন ভুলতে পারেননি আজও ? কেন ? একদিন দুদিন তো আর নয়, প্রায় তেইশ বছর আগে যে তার জীবন থেকে চলে গেছে, তাকে আজও কেন মনে রেখেছেন ? সেই কাজল-কালো চোখ, টানা টানা দুটি চোখ, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, দুধে আলতা গায়ের রঙ, লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, দীঘল-কালো চুলের মেয়েটাকে কেন ভুলতে পারেন না ? কেন আজও মনে রেখেছেন ? এই 'কেন'র উত্তর কি তিনি জানেন ? নাহ্, জানেন না। হয়তো ভালোবেসেছিলেন, খুব ভালোবেসেছিলেন বলে ভুলতে পারেন না; নয়তো কথা দিয়েও সেদিন যে কথা রাখেননি, সে অপরাধের জন্যে ভুলতে পারেন না। নিজের ফেলে আসা জীবন, কষ্ট, যন্ত্রণা নিয়ে এটা-সেটা ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই এ সময় ব্যক্তিগত সহকারী জানান, 'স্যার, আপনার মেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমার মেয়ে ! কী বলছেন আপনি !' আবুল হাসান যেন আকাশ থেকে পড়েন। 'আমার তো...'

কথা শেষ করতে পারেন না আবুল হাসান, ব্যক্তিগত সহকারী বলেন, 'আমিও তো তা-ই জানি স্যার। আপনার ওই এক ছেলে, কোনো মেয়ে নেই।'

'নাম জিজ্ঞেস করেছেন ?'

'জি স্যার।'

'কী নাম ?'

'অনন্যা, অনন্যা রহমান।' ব্যক্তিগত সহকারী বলেন, 'লাইন দেব স্যার ?'

'হ্যাঁ, দিন' বলতে আর একটুও দেরি করেন না আবুল হাসান।

টেলিফোনে ও-প্রান্ত থেকে অনন্যা বলে, 'হ্যালো, আমি অনন্যা।'

আবুল হাসানের এতক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাকা মন অনন্যার কণ্ঠস্বর শুনেই খুশিতে, আনন্দে ভরে যায়। তিনি বলেন, 'অনন্যা, এই অনন্যা।'

'বলুন।'

আবুল হাসান হাসেন, হো-হো করে হাসেন, হেসে বলেন, 'ব্যক্তিগত সহকারীকে তুমি যে বললে তুমি আমার মেয়ে, এটা কি ঠিক, মা ?'

'ঠিক, ঠিক, ঠিক, একশবার ঠিক।' অনন্যাও হাসে, জলতরঙ্গের মতো হাসে। 'আমি আপনার মেয়ে না হলেও মেয়ের মতো, এটা তো ঠিক।'

বিষণ্নতার যে কালো মেঘ এসে ছায়া ফেলেছিল চোখেমুখে, তা আর থাকে না, উবে যায়। অনন্যার কথা শুনে ভালো লাগে, বেশ ভালো লাগে আবুল হাসানের। তিনি তাই একই রকম হাসেন, হেসে বলেন, 'তো মা, তুমি কেমন আছ, বলো।'

'ভালো ছিলাম না, একটুও ভালো ছিলাম না।'

'কেন মা ?' আবুল হাসান টেলিফোনে এ-প্রান্ত থেকে বলেন, 'কী হয়েছে, আমাকে বলো।'

‘মার অসুখ। অসুখ মানে, ভাইরাস জ্বর।’ মার অসুখের চিঠি পেয়েই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীতে এই এক মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই তো, তাই।’ অনন্যা এবার আর হাসে না, ধীরে ধীরে বলে, ‘ভাবলাম, আপনার সঙ্গে কথা বললে বোধহয় মনটা ভালো হয়ে যাবে, তাই টেলিফোন করলাম। হ্যাঁ তাই, ঠিক তাই, আপনাকে টেলিফোন করার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আমার খুব ভালো হয়ে গেছে, একদম ভালো হয়ে গেছে, জানেন ?’

এতক্ষণ নিজের ফেলে আসা অতীত হাতড়াতে গিয়ে মনপ্রাণ সব একেবারে বিষণ্ন হয়ে গিয়েছিল, টেলিফোনে অনন্যার কাছ থেকে এ কথা শোনার পর ভেতরটা যেন একেবারে ভরে যায়, কানায় কানায় ভরে যায়। আবুল হাসান তাই হাসেন। ‘তা তোমার মার জ্বরটা ভাইরাস তো ?’

‘হ্যাঁ, ভাইরাস।’

‘একটা কথা বলব মা ?’

অনন্যা দেরি করে না, বলে, ‘অনুমতির কী দরকার, আপনি বলুন।’

‘তা তুমি এত দিন টেলিফোন করনি কেন, বলো তো ?’

‘বলব ?’

‘বলো।’

‘টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম, অনেকবার চেয়েছিলাম। কেন যে বারবার আপনাকে টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম, বলতেও পারব না।’ অনন্যা হাসে, হেসে বলে, ‘কিন্তু করিনি। কেন করিনি, জানেন ?’

‘কেন ?’

‘আপনি এত বড়লোক, এত বড় ব্যবসায়ী, এত ব্যস্ত মানুষ, যদি বিরক্ত হন, তাই।’

আবুল হাসান অনন্যার ছেলেমানুষি কথা শুনে হো-হো করে হাসেন। ‘এবার একটা প্রশ্ন করি তোমাকে ?’

অনন্যা বলে, ‘বেশ তো, করুন।’

‘তা আজ যে টেলিফোন করলে, এই যে কথা বলছ, তা কেমন লাগছে তোমার ?’ আবুল হাসান আগের মতোই হাসেন। ‘আমি বিরক্ত হয়েছি ? বিরক্ত হয়েছি তোমার ওপর ? নাকি খুশি হয়েছি, বলো ?’

একটুও দেরি করে না অনন্যা, বলে, ‘খুশি হয়েছেন।’

‘সবচে বেশি খুশি হয়েছি তোমার কোন কথায়, জানো ?’

‘কোন কথায় ?’

‘তুমি আমার ব্যক্তিগত সহকারীকে নিজের কী পরিচয় দিয়েছ ?’

আবুল হাসানের কথা বুঝি পুরোপুরি শেষও হয় না, টেলিফোনের ও-প্রান্তে অনন্যা জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হেসে বলে, ‘রাগ করেছেন ?’

‘না।’ আবুল হাসান বলেন, ‘আগে বলো, তুমি কী বলেছ ?’

‘আমি বলেছি, আমি আপনার মেয়ে।’ অনন্যা হাসে। ‘মেয়ের মতো আর মেয়ে তো প্রায় একই, তবে...’

‘তবে’ পর্যন্ত বলেই থেমে যায় অনন্যা। অনন্যাকে থেমে যেতে দেখেই আবুল হাসান বলেন, ‘কী, থামলে কেন ? তবে কী, বলো ?’

‘তবে আমি আপনার মেয়ে বলাতে আপনি যে খুশি হয়েছেন, খুব খুশি হয়েছেন, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি, জানেন ?’

‘হ্যাঁ মা, হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।’ আবুল হাসান বলেন, ‘আমি কী ভেবেছিলাম, জানো ?’

অনন্যা বলে, ‘কী ?’

‘দু-এক দিনের মধ্যে তুমি টেলিফোন না করলে, না এলে, আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব।’

আবুল হাসানের কথা শুনে অনন্যা হাসে, এবার আর কিছু বলে না সে।

‘অনন্যা।’

‘হুঁ, বলুন।’

‘তোমাকে কত দিন দেখি না, বলো তো ?’

অনন্যা হাসে। ‘প্রায় দেড় মাস।’

‘আমার কত দিন মনে হচ্ছে, জানো ?’

‘কত দিন ?’

‘প্রায় দেড় যুগ।’

অনন্যার ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। ‘আমাদের ধর্মে তো জন্মান্তর বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করলে আমি ধরেই নিতাম গত জনমে আপনি আমার...’

‘আপনি আমার’ পর্যন্ত বলেই আর বলতে পারে না অনন্যা, থেমে যায়।

আবুল হাসানের যেন ত্বর সয় না, তিনি বলেন, ‘কী হলো, বলো মা ?’

‘তাহলে ধরেই নিতাম, আপনি আমার বাবা।’

‘তাই ?’

‘হ্যাঁ, তাই।’

হো-হো করে হাসেন আবুল হাসান। ‘আচ্ছা মা, একটা প্রশ্ন করি তোমাকে ?’

‘বলুন।’

‘সেদিন হঠাৎ ট্রেনে দেখা, আর দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি।’ আবুল হাসান হো-হো করে হাসেন, হেসে বলেন, ‘তুমি আমাকে এত পছন্দ করে ফেলেছ কেন, বলো তো ?’

একটুও ভাবে না, দেরিও করে না, অনন্যা বলে, ‘সে প্রশ্ন তো আমিও আপনাকে করতে পারি। আপনিই বা সেদিন জার্নিতে দেখে, একটু দেখেই এত পছন্দ করে ফেলেছেন কেন আমাকে ?’

‘শুধু পছন্দ বললে তো হবে না মা।’ আবুল হাসান একই রকম হাসেন। ‘আরো কিছু, আরো অনেক কিছু।’

‘হ্যাঁ, তাই। আপনি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। মেয়ের মতো ভালোবেসে ফেলেছেন।’

‘আরে ধ্যাৎ, কী যে বলো না তার ঠিক নেই ! মেয়েকে মেয়ের মতো ভালোবাসব না তো কী, বলো ?’

আবুল হাসানের কথা ভালো লাগে। তাই আবুল হাসান এরপর কী বলেন তা শোনার জন্যে কান পেতে থাকে,

এবার আর কিছু বলে না অনন্যা।

'অনন্যা।' আবুল হাসানই আবার বলেন।

'বলুন।'

'তোমাকে একটা অনুরোধ করলে রাখবে অনন্যা?'

'ধ্যাৎ, কী যে বলেন না তার ঠিক নেই!' অনন্যা বলে, 'আপনি অনুরোধ করবেন আর আমি রাখব না, না? তা ছাড়া আপনি আমাকে অনুরোধই বা করতে যাবেন কেন!'

অনন্যার কথা বোঝার কথা নয়, বুঝতে পারেনও না আবুল হাসান।

একটু থেমে অনন্যা আবার বলে, 'বুঝতে পারলেন না?'

আবুল হাসান দেরি করেন না, বলেন, 'না তো!'

'আপনি তো আমাকে আদেশ করবেন, আদেশ, বুঝেছেন?' অনন্যা বলে, 'অনুরোধ করবেন না, কখনো অনুরোধ করবেন না। কারণ, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনুরোধের নয়। আদেশের, বুঝেছেন?'

'তাই?'

'জি, তাই।' জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হাসে অনন্যা। 'তো বলুন, এবার কী আদেশ, বলুন?'

'আজ দুপুরে তোমার কি কাজ আছে, বলো?'

'আজ?'

'হ্যাঁ, আজ।'

'দুপুরে একটা ক্লাস আছে যে।'

'কাল?'

'জি না, কাল কোনো কাজ নেই।'

'চলো না মা, কাল দুজনে কোথাও গিয়ে বসি, খাই।' আবুল হাসান বলেন, 'খেতে খেতে গল্প করি। আমার গল্প বলি, তোমার গল্প শুনি।'

'বেশ তো, যাব।' অনন্যা বলে, 'আপনি বলবেন আর আমি যাব না, না!'

'সত্যি বলছ তো মা?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। এবার হলো তো?'

'কাল ঠিক দেড়টায়, হোটেল শেরাটনে।'

শেরাটনের কথা শুনেই চমকে ওঠে অনন্যা। 'আরে বাপরে, অত বড় হোটেলে!'

আবুল হাসান অনন্যাকে চমকে উঠতে দেখে হাসেন, হেসে বলেন, 'আমার কত টাকা তা আমি নিজেও জানি না, জানো মা?'

'তাই?'

'তোমাকে নিয়ে যাব মা। এর চে ছোট হোটেলে কী করে যাই, বলো তো?'

‘বেশ তো, আমি ঠিক সময়ে চলে আসব।’ অনন্যা হেসে বলে, ‘তবে অত বড় হোটেলে আমি আর কখনো যাইনি, জানেন ?’

‘এখন থেকে যাবে, প্রায়ই যাবে।’ আবুল হাসানের যেন খুশির অন্ত নেই। তিনি হাসেন, হো-হো করে হাসেন। ‘তুমি কার মেয়ে দেখতে হবে না !’

অনন্যা দেরি করে না, বলে, ‘কার আবার, আপনার !’

৩

জায়গাটার নাম বালুখালী। পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা সবুজ সুন্দর একটা দ্বীপের মতো যেন জায়গাটা। পাশেই সমুদ্র, উত্তাল সমুদ্র, বঙ্গোপসাগর। বিরামহীন একটার পর একটা ঢেউ এসে ক্রমাগত যেন আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। বেলাভূমির শরীর ছুঁয়েই শান্ত সবুজ অরণ্য, পাহাড়। পাহাড় মানে একটা-দুটো নয়, একটার পর একটা উঁচু-নিচু পাহাড়। পিঠাপিঠি ভাইবোনের মতো, একটা ভালোবাসায় ভরা একান্নবর্তী সংসারের মতো যেন মিলেমিশে পাশাপাশি বাস করছে সমুদ্র, পাহাড় আর পাখিডাকা বড় শান্ত সবুজ বন। হঠাৎ দেখলে যে কেউ ভুল করবে। ভাববে, সমুদ্রের বুক চিরে ভেসে ওঠা একটা সবুজ দ্বীপই বুঝি।

এত সবুজ, এত সুন্দর, এত শুনশান শান্ত জায়গাটায় যেদিন প্রথম এল সুপ্তি, সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারেনি সে। মুগ্ধ দু চোখে আশপাশের চারদিকে তাকিয়ে দেখে একেবারে যেন থ হয়ে গিয়েছিল সে। একটা জায়গা এত সবুজ, এত সুন্দর, এত শান্তও হয় ! হতে পারে কখনো ! এ সত্যি ভাবতেও পারেনি সুপ্তি। জায়গাটা মনোরম বলে, এত সুন্দর বলেই যে সে এখানে এসেছিল তাও নয়। এত দূরে এই বালুখালী গার্লস স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা হয়ে আসার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল, চেনাজানা পরিচিত মানুষের কাছ থেকে, ঢাকা থেকে, ঢাকার অতি চেনা জনারণ্য থেকে সেদিন পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে। দ্বিতীয়ত, পত্রিকার বিজ্ঞাপনেই স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে তার জন্যে কোয়ার্টারের উল্লেখ ছিল। মাথার ওপর একটা ছাউনি, মানে একটা থাকার ব্যবস্থারও সেদিন বড় বেশি প্রয়োজন ছিল তার। বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টারটাও এত সুন্দর, এত দৃষ্টিনন্দন যে আজও এ কোয়ার্টারকে প্রথম দিন দেখার মতোই মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে দেখে সে।

ঢাকাতেই জন্ম, ঢাকাতেই বড় হওয়া, ঢাকাতেই পড়াশোনা করা সুপ্তি এখানে আসার আগে জীবনে কখনো সমুদ্র দেখা তো দূরের কথা, পাহাড়ও দেখেনি, অরণ্যও দেখেনি। যেদিকে দু চোখ যায় ঘন সবুজ বন, পাহাড়, চেনা-অচেনা গাছগাছালি, রঙবেরঙের বিচিত্র সব পাখি, পাখির কিচিরমিচির, সমুদ্র, অশান্ত সমুদ্রের ক্লান্তিহীন গর্জন। সব দেখেশুনে তো প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো জায়গাটার একেবারে প্রেমে পড়ে যায় সে। মনে আছে, যেদিন এখানে এল তার পরদিন বিকেলে যখন সমুদ্র দেখতে গেল, সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, শুধু ভালো লাগাই নয়, মুগ্ধ হওয়াই নয়, একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। যেদিকে দু চোখ যায় শুধু জল আর জল, অনন্ত জলরাশি। একটার পর একটা ঢেউ ক্রমাগত আসছে আর যাচ্ছে। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে সেদিনই প্রথম সূর্যাস্ত দেখল। জলে, চরাচরে, অরণ্যে, পাহাড়ে লাল আভা ছড়িয়ে একটা ঝলমলে, চকচকে সোনার থালার মতো ধীরে ধীরে সূর্যটা সীমাহীন জলরাশির মধ্যে মুখ লুকাল।

এখানে, এই বালুখালীতে সেদিন ইংরেজির শিক্ষিকা হিসেবে এসে জয়েন করেছিল। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ছাত্রীদের প্রতি, স্কুলের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায় সুপ্তি আজ শুধু প্রধান শিক্ষিকাই নয়, এই স্কুলের অন্যতম বন্ধু আর প্রধান অভিভাবকও। স্কুল, স্কুলের ছাত্রীদের যে একা সে ভালোবাসে তা নয়; ছাত্রীরা, স্কুল কমিটি, স্থানীয় লোকজন সবাই দ্বিধাহীনভাবে তাকেও ভালোবাসে, অপরিসীম শ্রদ্ধা করে।

একটা চাকরি তার তখন খুব দরকার, খুব। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে চাকরিটা হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতে দরখাস্ত করা, চাকরি হয়ে যাওয়া, আর সোজা এখানে চলে আসা। তারপর দিন যত গড়াতে থাকে, স্কুলটাকেই শুধু নয়, ছাত্রীদের, এখানকার লোকদেরও একেবারে ভালোবেসে ফেলা। এখন অবস্থা এমনই যে, এই

এলাকাই তার পৃথিবী, এ-ই তার জীবন।

কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যাওয়ার পথে উখিয়া উপজেলার অধীন এই বালুখালী নামের ছোট্ট জায়গা। পাহাড় আর অরণ্যের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে উঁচু-নিচু পিচঢালা রাস্তা। এখানে, এই শান্ত-সুন্দর পরিবেশে অরণ্য, সমুদ্র আর পাহাড়ই আছে তা নয়, নদীও আছে একটা। নাফ নদী। কলকল করে বয়ে চলা স্রোতস্বিনীর এপারে বাংলাদেশ, ওপারে মিয়ানমার। যেন অনেকটা 'এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি'র মতো। রাস্তার কোল ঘেঁষে বাজার, বালুখালী বাজার। বাজারটা একেবারে ছোটও নয়, আবার বড়ও নয়। মাঝারিই বলা যায়। সপ্তাহের দুদিন হাট বসলেও প্রতিদিনই টুকটাক বেচাকেনা হয় এখানে। হাটের দিন বাঙালি-উপজাতি নির্বিশেষে দলে দলে সার বেঁধে ফলমূল, তরিতরকারি ইত্যাদি নিয়ে বাজারে আসে, আপন আপন পসরা সাজিয়ে বসে।

রাস্তা থেকে কয়েক পা হেঁটেই অরণ্য আর পাহাড়ের ঠিক বুক বরাবর বালুখালী গার্লস স্কুল। বাঁশের কঞ্চির বেড়া আর টিনশেড স্কুলটা দেখতে অনেকটা বিশাল একটা বাংলোবাড়ির মতো। স্কুলের গা ঘেঁষেই শিক্ষিকাদের কোয়ার্টার। অরণ্য আর পাহাড়ের মাঝখানে স্কুলটা দেখে সেই যে প্রথম দিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজও সেই মুগ্ধতার ঘোর পুরোপুরি বুঝি কাটেনি সুপ্তির।

বহু বছর আগে সেই যে একদিন বাসে চেপে একটা সুটকেস হাতে ঢাকা থেকে সোজা এখানে এসে উঠেছে, আজ অবধি কোথাও যায়নি। এক দিন, এমনকি এক ঘণ্টার জন্যেও কোথাও যাওয়ার নাম করেনি। কেন কোথাও যায় না সে ? এখানকার মানুষজনকে, শান্ত সুন্দর প্রকৃতিকে ভালো লেগেছে বলে ? এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাকে ভালোবাসে বলে ? সুপ্তি নিজেও জানে, না, তা নয়। কারণ একটাই, যে চেনাজানা পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে, সেই চেনা পৃথিবীর সামনে গিয়ে আর কখনো দাঁড়াতে চায় না সে।

এতটা বছর ধরে আর কিছু হোক না হোক নিরলসভাবে একটা কাজ ঠিকই করেছে সে, তা হচ্ছে নিজের ফেলে আসা কৈশোর, যৌবন, কৈশোরের সোনালি সময়, স্বপ্নময় দিন, রঙিন দিনগুলোকে, নিজেকে, নিজের অতীতকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি ভুলে যাওয়া যায় ? যদি ভুলেই যাওয়া যেত তাহলে প্রায়ই সেই দিনগুলোর কথা ভেবে, পাওয়া না-পাওয়ার কথা ভেবে কাঁদতে হতো না তাকে।

ভাইয়ার বন্ধু ছিল ও। নাম শুভ্র। বড়লোকের ছেলে হলে যা হয়, গাড়ি চালাত, বেনসন ফুঁকত, দামি জামা-কাপড় পরত, দু-তিন রকমের পারফিউম ককটেল করে গায়ে মাখত। যখনই তাদের বাড়িতে আসত, বসত, সমস্ত ঘর পারফিউমের সুগন্ধিতে ভরে যেত, ম-ম করত। কথাবার্তা বলত একদম গুছিয়ে, স্মার্টলি। লেখাপড়ায়ও ছিল মেধাবী, ব্রিলিয়ান্ট। এত কিছু দেখেই যে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল তা নয়। এক পা দু পা করে ধীরে ধীরে ও-ই আসলে এগিয়ে এসেছিল। নাছোড়বান্দার মতো তার পিছে লেগে থেকে তার মনপ্রাণ সব জয় করে নিয়েছিল।

নানা অছিলায় ও কথা বলতে চেয়েছে, এগিয়ে আসতে চেয়েছে। সুপ্তি কিন্তু এক পা এগিয়েও এটা-সেটা ভেবে দু পা পিছিয়ে গেছে। সুপ্তি জানত, তেলে-জলে কখনো মেশে না; এ হওয়ার নয়, হবেও না কখনো। তাই ভালো লাগার পরও, একটু একটু করে ভালোবেসে ফেলার পরও এগোতে চায়নি, বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে ওকে। মানুষ তো, মানুষের মন তো, রোবট তো আর নয়, শেষমেশ তাই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি বলেই শুভ্রর কাছে, শুভ্রর এত ভালোবাসার কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়া।

একদিনের কথা আজও মনে আছে তার। ভাইয়া সেদিন চট্টগ্রামে। খালার বাড়িতে। শুভ্র এল, সোফায় পা এলিয়ে বসল। তারপর মুখোমুখি বসা সুপ্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপ্তি।'

সুপ্তি কালবিলম্ব না করে বলে, 'বলুন।'

'তোমার বাবা তো অফিসে।'

‘হুঁ।’

‘মাকেও তো দেখলাম, বাজারে যাচ্ছেন।’

সুপ্তি বলে, ‘হুঁ।’

‘তোমার ভাইয়া তো চিটাগাং।’

সুপ্তি এবার আর কিছু বলে না, কেবল হাসে।

‘বাড়িতে তুমি একা, তাই না ?’

সুপ্তি এবার আর চুপ করে থাকে না, বলে, ‘একা কোথায়, আপনি তো আছেন।’

শুভ্র অস্ফুট স্বরে বলে, ‘সুপ্তি !’

সুপ্তি বলে, ‘বলুন।’

‘আমি কী বলতে চাই, জানো না তুমি ?’ শুভ্র গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। ‘বলো সুপ্তি, বলো, জানো না ?’

শুভ্রর এ প্রশ্নের উত্তরে সুপ্তি হাসে, কিছুই বলে না।

‘প্রথম প্রথম আমি তোমাকে এটা-সেটা বলে বোঝাতে চেয়েছি। তুমি বুঝেও না বোঝার ভান করেছ। তারপর একটা ছোট্ট চিরকুটে ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি’ লিখে তোমার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়েছি। তারপরও তুমি কিছু বলনি। এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছ, আমার দিকে তাকিয়েছ, যেন কিচ্ছু হয়নি, কিছুই জানো না তুমি।’

একটানা কথা বলে থামে শুভ্র। শুভ্র থামলেও সুপ্তি একই রকম হাসে, কিছুই বলে না।

বড় অসহায়ের মতো তাকায় শুভ্র। ‘তুমি হাসছ সুপ্তি ?’

সুপ্তি হাসে, হেসে বলে, ‘হুঁ।’

‘আমার জীবন-মরণ, আমার ভালোবাসা নিয়ে তুমি হাসছ ?’

এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে সুপ্তি কখনো ভাবেনি। সে তাই উত্তর না দিয়ে এবারও হাসে।

দিশেহারা ভঙ্গিতে তাকিয়ে শুভ্র আবারও বলে, ‘সুপ্তি !’

সুপ্তি অপেক্ষা করে না, বলে, ‘বলুন।’

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি সুপ্তি।’

‘কথাটা আপনি চিরকুটেও লিখেছেন।’

‘হ্যাঁ সুপ্তি, হ্যাঁ।’ উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকায় শুভ্র। ‘মরে যাব, বাঁচব না। সত্যি বাঁচব না আমি।’

সুপ্তির মনে আছে, তার ভেতরেও তখন ঝড়, উথাল-পাথাল ঝড়, এক বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব। সেও দিশেহারার মতো তাকায়, তাকিয়ে বলে, ‘যদি বলি, এসব আপনার বানানো কথা, আপনি মিথ্যে বলছেন !’

‘কী বলছ তুমি ! কী বলছ সুপ্তি !’

‘আমি কী বলেছি আপনি শুনেছেন।’

‘আমার কথা সব মিথ্যে ? বানানো ?’

‘হ্যাঁ, বানানো।’

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি না, না ?’

‘হয়তো বাসেন।’

‘হয়তো বলছ সুপ্তি ! হয়তো বলছ তুমি !’

সুপ্তি বলে, ‘একটা কথা বলব ?’

একটুও দেরি করে না শুভ্র, বলে, ‘বলো।’

‘পুরুষমানুষকে আমি বিশ্বাস করি না, জানেন ?’

‘কেন ! কেন বিশ্বাস কর না !’

‘কেন ?’

‘হ্যাঁ, কেন, বলো।’

‘আজ আপনি হয়তো যে কথা বলছেন, যা ভাবছেন, কাল হয়তো তা থাকবে না।’

‘কী বলছ সুপ্তি !’ উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকায় শুভ্র। ‘কী বলছ তুমি এসব !’

‘আর...’

‘আর কী, বলো ?’

‘তেলে-জলে কখনো মেশে না, জানেন তো ?’

সুপ্তির কথা বুঝতে পারে না শুভ্র, তাই বলে, ‘তার মানে ! তেলে-জলে মেশামিশির সঙ্গে তোমার-আমার ভালোবাসার কী সম্পর্ক, বলো ?’

‘কোথায় আপনি, আর কোথায় আমরা !’ সুপ্তি বলে, ‘আপনার বাবার কত টাকা, কত রকমের ব্যবসা তিনি নিজেও জানেন না।’

সুপ্তি থামে। সুপ্তি থামতেই শুভ্র ঝাঁঝালো গলায় বলে, ‘কী হলো, থামলে কেন ? বলো, আর কী বলবে, বলো ?’

‘আমরা ? আমরা কত গরিব, রোজ সকাল-সন্ধ্যায় নুন আনতে পান্তা ফুরায় আমাদের, জানেন তো ?’

শুভ্র একইভাবে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, ‘তাই নাকি ?’

‘হ্যাঁ, তাই।’ সুপ্তি বলে, ‘একটা প্রশ্ন করব আপনাকে ?’

শুভ্র তখন রেগে গেছে, ভীষণ রেগে গেছে। রেগেমেগে কটমট করে তাকায় সে। ‘সবই তো বলছ, অত অনুমতি চাওয়ার আর কী দরকার ?’

‘আচ্ছা বলুন তো, শত ইচ্ছে করলেও, চেষ্টা করলেও আমি কি আকাশের চাঁদ ছুঁতে পারি ?’

পাগলের মতো একবার ওঠে, আবার বসে শুভ্র। বসে বলে, ‘এবার আমি একটা কথা বলি ?’

‘বলুন।’

‘ভণিতা না করে সোজা প্রশ্নটার সোজাসুজি উত্তর দেবে তো তুমি, বলো ?’

‘আপনি বলুন।’

‘আমাকে তোমার ভালো লাগে না, বলো সুপ্তি?’ দিশেহারার মতো তাকায় শুভ্র। ‘ভালো লাগে না, বলো?’

সুপ্তি এ প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে ভাবে না, দেরিও করে না, বলে, ‘হুঁ, লাগে। ভালো লাগে।’

এরপর যা করে শুভ্র তার জন্যে সেদিন আসলে একটুও প্রস্তুত ছিল না সুপ্তি। ছুটে আসে সে, অনেকটা ঝড়ের মতো এসে সুপ্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার একটা হাত ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, ‘তাহলে ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন সুপ্তি? ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন তুমি, বলো?’

‘গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই যে!’

‘কেন সুপ্তি? কেন?’ গভীর আবেগে সুপ্তির চোখে চোখ রেখে শুভ্র বলে, ‘কী নেই আমার, বলো? শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক মর্যাদা, আভিজাত্য, অর্থসম্পদ, কী নেই আমার?’

সুপ্তি অস্ফুট স্বরে বলে, ‘সব আছে, সব।’

‘তাহলে? তাহলে ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন সুপ্তি?’

এত আবেগের, এত ভালোবাসার সামনে সুপ্তির ভেতরটা যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ভেতর থেকে কে যেন বলে, এই মেয়ে, তুই এ কী করছিস রে! হাতের মুঠোয় এত ভালোবাসা, অথচ হাতছাড়া করছিস পোড়ামুখী! তুই কী রে! কী তুই!

শুভ্রর যেন ত্বর সয় না, সে আবারও বলে, ‘তাহলে ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন সুপ্তি? ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন তুমি, বলো?’

‘বলেছি না, আপনার সব আছে।’ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কোনোমতে সুপ্তি বলে, ‘শিক্ষাদীক্ষা, অর্থ, বংশমর্যাদা, সব আছে আপনার, সব। কিন্তু...’

‘কিন্তু’ পর্যন্ত বলেই থেমে যায় সুপ্তি। সুপ্তিকে থেমে যেতে দেখেই শুভ্র বলে, ‘কিন্তু কী, বলো। বলো সুপ্তি।’

‘কিন্তু আমার যে কিছুই নেই।’ দাঁতে দাঁত চেপে সুপ্তি বলে, ‘আমরা গরিব। আমার বাবা মতিঝিলে একটা সওদাগরি অফিসের কেরানি, বুঝেছেন, কেরানি।’

এক মুহূর্ত দেরি করে না শুভ্র, বলে, ‘তাতে কী হয়েছে?’

এতক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, এবার চোখে চোখ রেখে তাকায় সুপ্তি। ‘কিছুই হয়নি, না?’

শুভ্র ভাবে না, দেরিও করে না, বলে, ‘না হয়নি, কিচ্ছু হয়নি।’

আর বসে থাকতে পারে না, উঠে দাঁড়ায় সুপ্তি। ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বাইরে তাকায় সে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ‘এবার শেষ প্রশ্নটা করি, কেমন?’

‘বেশ তো, করো।’

‘আপনার বাবা মেনে নেবেন, আপনার এই প্রেম, এই ভালোবাসা?’

‘নেবেন সুপ্তি, নেবেন। নিশ্চয়ই নেবেন। আমি ওনার একমাত্র ছেলে।’

শুভ্রর দিকে তাকায়ও না, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অস্ফুট বলে, ‘আমার বিশ্বাস হয় না।’

‘কেন? বিশ্বাস হয় না কেন?’

সুপ্তি আবার এসে মুখোমুখি বসে, বসে বলে, ‘কারণ, আপনি আকাশের চাঁদ, বুঝেছেন, আকাশের চাঁদ। ইচ্ছে করলেই আমি আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে আনতে পারি না।’

মুখোমুখি বসে ছিল শুভ্র। এবার আর হাঁটু গেড়ে সামনে বসে না। জোর করে হাত ধরে টেনে তোলে সুপ্তিকে। তারপর যা বলে, যা করে, ভাবতে গেলে আজও কেঁপে ওঠে সুপ্তি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুকের মধ্যে জাপটে ধরে তাকে। জাপটে ধরে ঠোঁটে, গালে, কপালে একটার পর একটা চুমু দিয়ে বলে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না সুপ্তি, বাঁচব না, বিশ্বাস করো তুমি, বিশ্বাস করো !'

বাধা দেবে কি, সুপ্তি বুঝতে পারে, তারও ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে।

সেই শুরু। এরপর শুভ্রকে শুধু ভালোবাসা। শুভ্রর ভালোবাসায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা, নিঃশেষ করে দেয়া।

শুরু হয় অভিসার। শুভ্রর পাশে বসে, তার গাড়িতে বসে কোনো দিন সাভার, কোনো দিন জয়দেবপুর, কোনো কোনো দিন আশুলিয়া, কোনো দিন আবার দাউদকান্দি। কখন শুভ্রকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলা শুরু করে বলতেও পারবে না।

শেষমেশ এমনই অবস্থা হয় যে, একদিন শুভ্রকে না দেখলে, একদিন শুভ্রর সঙ্গে কোথাও না কোথাও ঘুরতে-বেড়াতে না গেলে মনপ্রাণ সব বিষণ্ন হয়ে থাকে। শুভ্র ছাড়া যেন কিছু নেই, শুভ্র ছাড়া যেন কিছু থাকতে পারেও না জীবনে। রাতদিন এমনই অবস্থা যে, শয়নে শুভ্র, স্বপনে শুভ্র, জাগরণেও ওই এক শুভ্রই। সুপ্তি ভোলেনি। আজও মনে আছে সব। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তার শুভ্রময় হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

কিন্তু তারপর ? তারপর যা ঘটার তা-ই ঘটে, একটুও এদিক-সেদিক হয় না। শুভ্র তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তার ধনী বাবা সুপ্তিকে মেনে নেবেন কেন ? না, শুভ্রর ধনী বাবা, অহঙ্কারী বাবা, দাম্ভিক বাবা কিছুতেই তার আর শুভ্রর সম্পর্কটা মেনে নিতে পারেন না। ব্যস, বিষয়টা টের পেয়ে শুভ্রর বাবা তড়িঘড়ি করে এদিক-ওদিক ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজতে নেমে পড়েন।

'এখন কী হবে শুভ্র ?'

'কী আবার হবে !' শুভ্র সুপ্তির একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলে, 'তুমি আমাকে ভালোবাস, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমরা দুজন ঘর বাঁধব।'

'কিন্তু তোমার বাবা...'

কথা শেষ করতে দেয় না সুপ্তিকে, শুভ্র বলে, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না সুপ্তি, বলো ?'

'করি তো।'

'কতটা বিশ্বাস করো, বলো ?'

'পুরোপুরি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করো তুমি !'

একটু হলেও ভাবে শুভ্র, ভেবে বলে, 'আমার বাবা তোমাকে মেনে নেবেন না, এটা আমি শেষমেশ বুঝতে পেরেছি সুপ্তি।'

'তাহলে ?' কখন কেঁদে ফেলেছে বলতেও পারবে না। ভেজা চোখে শুভ্রর দিকে অসহায়ের মতো তাকায় সুপ্তি। 'তাহলে কী হবে ?'

'সাহস আছে তোমার ?'

শুভ্রর কথা বুঝতে পারে না সুপ্তি। সে তাই বলে, 'সাহস ? কী বলছ তুমি ?'

'আমরা এখন সোজা মগবাজার কাজি অফিসে যাব। বিয়ে করব। সাহস আছে তোমার, বলো ?'

'বিয়ে ! কাজি অফিস !' হতভম্ব হয়ে যায় সুপ্তি, শুভ্রর কথা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় সে। 'এখন আমরা কাজি অফিসে যাব ! বিয়ে করব ! কী বলছ তুমি ! তোমার কি মাথা ঠিক আছে, বলো তো !'

‘এ ছাড়া যে আর কোনো উপায় নেই সুপ্তি।’

‘কিন্তু চোরের মতো...’

কথা শেষ করতে দেয় না সুপ্তিকে, শুভ্র কথা কেড়ে নিয়ে বলে, ‘চোরের মতো বলছ কেন ? এ আমাদের অধিকার, ভালোবাসার অধিকার। আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসি। আমরা ভালোবেসে একজন আরেকজনকে পাব, এ আমাদের অধিকার।’

‘কিন্তু...’

‘আর কোনো ‘কিন্তু’ নয়, ‘তবু’ নয়, সুপ্তি চলো।’

‘কোথায় ? কাজি অফিস !’

‘হ্যাঁ, কাজি অফিস।’

‘আমার ভয় করছে।’ কেঁপে ওঠে সুপ্তি, ভয়ানক কেঁপে ওঠে সে। ‘ভীষণ ভয় করছে, জানো ?’

‘ভয় আমারও করছে সুপ্তি।’ শুভ্র বলে, ‘কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোনো উপায় নেই।’

‘তোমাকে একটা অনুরোধ করব ?’

শুভ্র বলে, ‘বলো, কী বলবে ?’

‘তোমার বাবার কাছে আর একবার যাও না, গিয়ে বলো না।’

অনেক দুঃখেও ম্লান হাসে শুভ্র। ‘আমার বাবাকে তুমি চেনো না।’

‘তুমি আমার কথা ওনাকে বলেছিলে ?’

‘হ্যাঁ, বলেছিলাম।’

‘উনি রাজি হননি, না ?’

শুভ্র এদিক-সেদিক তাকায়। ‘না সুপ্তি।’

সুপ্তির তবু মন মানে না। সে তাই আবারও বলে, ‘উনি কী বললেন ?’

‘শুনতে চেয়ো না সুপ্তি, তুমি শুনতে চেয়ো না।’ শুভ্র অসহায়ের মতো বলে, ‘উনি কী বলেছেন তুমি শুনতে চেয়ো না, প্লিজ।’

‘তবু তুমি বলো, আমি শুনব।’

‘আমি ওনাকে সব বলেছি, সব। তোমার কথা, তুমি কত ভালো মেয়ে, সে কথা।’ শুভ্রও কেঁদে ফেলে। কেঁদে এদিক-সেদিক তাকায়। ‘সব শুনে বাবা শুধু বললেন, সম্ভব নয়। একটা হাভাতে ঘরের মেয়েকে, একটা ছোটলোকের মেয়েকে আমি আমার পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে আনতে পারি না। এ অসম্ভব।’

জয়দেবপুর ন্যাশনাল পার্কে বসে কথা হচ্ছিল দুজনের। শুভ্রর কথা বুঝি পুরোপুরি শেষও হয় না, অপমানে, কষ্টে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুপ্তি। এরপর পথ খোলা থাকে দুটো। হয় শুভ্রকে ভুলে যাওয়া, চিরদিনের জন্যে ভুলে যাওয়া, নয়তো শুভ্রর কথায় সাড়া দেয়া, কাজি ডেকে অথবা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করা, শুভ্রকে চিরদিনের জন্যে আপন করে পাওয়া।

শুভ্রকে চিরদিনের জন্যে কাছে পাবে বলে সেদিন কাজি ডেকে বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিয়ে করেছে ঠিকই, কিন্তু তারপর ? শুভ্রকে চিরদিনের জন্যে কাছে পেয়েছে সে ? এ প্রশ্নের নির্মম উত্তর জানে সুপ্তি। না, পায়নি।

কেন শুভ্রকে পেয়েও পেল না সুপ্তি ? এর জন্যে কে দায়ী ? সে ? শুভ্র ? না শুভ্রর অহঙ্কারী বাবা ? সুপ্তি জানে, এর কোনোটাই নয়। দায়ী তার ভাগ্য, দায়ী তার কপাল, দায়ী তার নিয়তি।

এটাওটা এলোমেলো ভাবনাচিন্তার মধ্যেই পিয়ন এসে অনন্যার একটা চিঠি দিয়ে যায়। নিজেকে নিয়ে, নিজের ফেলে আসা জীবন নিয়ে কত কি ভাবতে গিয়ে মনপ্রাণ বিষণ্ন হয়ে ছিল, অনন্যার চিঠি পেয়ে মনপ্রাণ সব আবার অন্তহীন খুশিতে ভরে যায়। খুশিতে ভরে যাবেই বা না কেন ? অনন্যাই তো আজ তার সব। আজও যে বেঁচে আছেন, স্বপ্ন দেখছেন, হাসছেন, তা কার জন্যে ? অনন্যা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কে আছে তার ? আছে কেউ ? নিজেও জানেন, না, নেই।

৪

অনন্যা হোটেল শেরাটনে পৌঁছার আগেই আবুল হাসান তার লেটেস্ট মডেলের বিশাল পাজেরো গাড়ি নিয়ে হোটেল শেরাটনে এসে পৌঁছান। অনন্যা না পৌঁছা পর্যন্ত আর কোনো কাজ নয়, অবিরাম মোবাইল বাজলেও তা রিসিভ করা নয়, হোটেলের লবিতে উৎকণ্ঠা নিয়ে পায়চারি করেন, অনন্যার প্রতীক্ষায় থাকেন, আর বারবার কেবল হাতঘড়ি দেখেন তিনি।

অনন্যা একটা সবুজ সিএনজি বেবিট্যাক্সি নিয়ে শেরাটনের সামনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই মুখে অমলিন হাসি ফুটে ওঠে এবং পড়ি কি মরি করে ছুটে যান আবুল হাসান। অনন্যা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে টাকা গুনে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দেয়ার আগেই মানি ব্যাগ খুলে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মিষ্টি হাসেন তিনি। 'দেরি হয়ে গেল অনন্যা, বড় দেরি হয়ে গেল তোমার।'

অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। 'দেরি হয়ে গেল !'

'আমি কখন এসেছি, জানো ?'

অনন্যা বলে, 'কখন ?'

'প্রায় এক ঘণ্টা।'

'এক ঘণ্টা আগে এসেছেন কেন ?'

'আসব না ! আরে, কী বলছ তুমি !' আবুল হাসান বলেন, 'তুমি আসবে আর আমি ঠিকমতো আসব না, না ?'

অনন্যা হাসে। 'আপনার ভুল ধরিয়ে দেয়া দরকার।'

'ভুল !'

'হ্যাঁ, ভুল।' আবুল হাসানের পাশাপাশি হেঁটে অনন্যা রেস্টুরেন্টে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। 'আপনি ঠিক সময়ে আসেননি।'

'ঠিক সময়ে আসিনি মানে ! কী বলছ তুমি !'

'আমাকে আপনি কটায় আসতে বলেছেন ?'

'কেন, দেড়টায়।'

'এখন কটা বাজে, দয়া করে আপনার হাতঘড়িটা দেখুন তো।'

আবুল হাসান নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারেন, ভুল করে ফেলেছেন। তিনি তাই কটা বাজে সে কথা না বলে অবাক হয়ে বারকয়েক হাতঘড়ির দিকে তাকান।

‘আমাকে দেড়টায় আসতে বলে নিজে সাড়ে বারোটায় এসে দাঁড়িয়ে থেকে হাপিত্যেশ করলে কার দোষ– আমার, না আপনার ? বলুন তো দেখি ?’ অনন্যা হাসে। ‘তা দাঁড়িয়েই থাকবেন, না বসবেন ?’

‘দেখো তো কী কাণ্ড, এখনো তোমাকে বসতেই বলা হয়নি।’ আবুল হাসান হাসেন। ‘ইস্ রে, কেমন ভুলো-মন আমার, দেখো তো দেখি মা।’

‘মা ?’

‘হ্যাঁ, মা।’ আবুল হাসান একই রকম হাসেন। ‘সেদিনই তো বলেছি, তুমি যে আমার মা !’

অনন্যা বসে, বসেই বলে, ‘তা আমি একা বসব, না আপনিও বসবেন ?’

অনন্যার কথা শুনেই হুঁশ হয়। তাই বসেন, বসেই বলেন আবুল হাসান, ‘দেখো তো কী কাণ্ড, তোমাকে বসতে বলছি অথচ নিজেই বসছি না। আজ আমার কী হয়েছে, বলো তো মা ?’

অনন্যা হাসে, হেসে বলে, ‘জানি।’

‘জানো ? তো বলো ?’

‘আগে আমি যে প্রশ্ন করব তার ঠিক ঠিক জবাব দেবেন কি না বলুন ?’

আবুল হাসান মুখোমুখি বসা অনন্যার দিকে তাকান। ‘দেব, নিশ্চয়ই দেব। তুমি বলো।’

‘আমাকে আসতে না দেখে আপনি নিজের হাতঘড়ির দিকে কবার তাকিয়েছেন, বলুন তো ?’

অনন্যার কথা শুনে আবুল হাসান অবাক হয়ে বলেন, ‘এ কথা কেন বলছ মা ?’

‘আগে বলুন না, কবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছেন ?’

‘হবে, তা বেশ কবার তো হবেই।’

অনন্যা হাসে। ‘বেশ কবার বললে তো হবে না। তা বেশ কবার মানে, কবার, বলুন ?’

‘গুনে তো আর রাখিনি। তা ধরো সাত-আটবার।’

‘না, আমার ধারণা আপনি ঠিক বলেননি।’

‘কী বলছ তুমি !’ আবুল হাসান অবাক হয়ে তাকান। ‘ঠিক বলিনি মানে !’

অনন্যা একই রকম হাসে। ‘আমার ধারণা, আপনি অনেকবার ঘড়ি দেখেছেন। সেই অনেকবারটা একশবারের ওপরও হতে পারে, আবার সামান্য কমও হতে পারে।’

আবুল হাসান অনন্যার কথা শুনে বোকার মতো মাথা নাড়েন। ‘হবে হয়তো। তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। আমি আসলে দু-চারবার নয়, তুমি আসছ না দেখে নিজের অজান্তে বারবার হাড়ঘড়ির দিকে তাকিয়েছি।’

‘আমার দেড়টায় আসার কথা, আমি কিন্তু দেড়টা বাজবার তিন মিনিট আগেই এসেছি।’

আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, ‘হুঁ, এখন তো দেখছি তুমি ঠিক সময়ই এসেছ।’

‘এই যে আমি আসছি না দেখে আপনার পেরেশান হওয়া, ঘড়ি দেখেও আমি দেরি করে ফেলেছি ভাবা, এখানে এসেও নিজে না বসা, আমাকেও বসতে না বলা– এসব কিসের জন্যে, কিসের আলামত, বলব ?’

‘বেশ তো, বলো।’

‘এ হচ্ছে, আপনি আমাকে খুব, খুব ভালোবেসে ফেলেছেন, এ তার আলামত।’

প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে যেন অন্তহীন খুশি ছড়িয়ে যায় আবুল হাসানের। মনে পড়ে না, এত ধন-সম্পদ, এত ব্যবসা, এত বিলাস, এত প্রাচুর্যের মধ্যেও ইদানীং এত খুশি কখনো হয়েছেন। অন্তহীন আনন্দে যেন লাফিয়ে ওঠেন তিনি। 'ঠিক বলেছ মা, একদম ঠিক বলেছ তুমি। এত ঠিক বলেছ যে...'

কথা শেষও করতে পারেন না আবুল হাসান, মুখ থেকে ঈগলের মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নেয় অনন্যা। 'সব ঠিক কিন্তু এখনো বলা হয়নি আমার। আরো একটা ঠিক কথা বলা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে।'

আবারও মুখোমুখি বসা অনন্যার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকান। তাকিয়ে বলেন, 'কী মা, বলো তুমি ?'

'আমাকে এখানে কেন ডেকেছেন ?' অনন্যা বলে, 'বলুন, কেন ডেকে এনেছেন ?'

অনন্যার কথা এবারও বুঝতে পারেন না আবুল হাসান। তিনি তাই বলেন, 'কেন, বলো তো ?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর বলছি।'

'আমি আজ আসলে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি একসঙ্গে বসে খাব আর গল্প করব বলে, অন্য কিছু নয়।'

'ঠিক সময়ে আসার পরও বললেন দেরি করে এসেছি, রেস্টুরেন্টে ঢোকার পরও আমাকে বসতে বলা কি, নিজেও দাঁড়িয়ে ছিলেন ! খাওয়ার কথা মুখে বলছেন, কিন্তু অর্ডার দিচ্ছেন না !' অনন্যা এবার আর নিঃশব্দে নয়, সামান্য শব্দ করেই হাসে। 'আপনার আজ উল্টোপাল্টা কী হয়েছে, বলুন তো ?'

নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং বুঝতে পেরে দ্রুত বলেন আবুল হাসান, 'ছি-ছি-ছি, তোমাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছি ভালো-মন্দ কিছু খাওয়াব বলে, কিন্তু অর্ডার দেয়ার কথাই বেমালুম ভুলে বসে আছি। তো বলো মা, কী খাবে, বলো। জলদি বলো।'

'ধ্যাৎ, কী যে বলেন না তার ঠিক নেই।' অনন্যা বলে, 'আমি এত বড় হোটেলে আর কখনো এসেছি নাকি যে এসব খাবারের নাম জানব ?'

'অর্ডার দিয়েও খাওয়া যেতে পারে, আবার বুফেও খেতে পার।'

'বুফে !'

'এসো, আজ বরং বুফেই খাই।' আবুল হাসান বলেন, 'দেখো, খাবার সব সাজানো আছে। যা ইচ্ছে হয় খাবে, যেটা ভালো লাগবে না, পছন্দ নয়, খাবে না।'

'বেশ, চলুন।'

দুজনে দুজনার প্লেটে খাবার-দাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে আবার আগের টেবিলটায় মুখোমুখি বসে।

'এবার বলুন, কী বলবেন বলুন।' অনন্যা খাওয়া শুরু করে বলে।

'কী বলব ?'

'মনে নেই ?' অনন্যা খেতে খেতেও হাসে।

'কী ?'

'খেতে খেতে গল্প করবেন বলেছেন। মনে নেই, না ?'

আবুল হাসান বলেন, 'হুঁ, বলেছি তো।'

'তো কই, শুরু করুন।'

'অনন্যা।'

অনন্যা বলে, 'বলুন।'

'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, এটা বুঝতে পারছ তুমি?'

'পারছি না আবার!' অনন্যা খেতে খেতেও হাসে। 'ঠিক সময়ে আসার পরও আপনার যে অবস্থা, যে কথাবার্তা, বুঝতে পারছি না আবার!'

'হ্যাঁ অনন্যা, হ্যাঁ। ভালো লেগেছে, তোমাকে আমার খুব, খুব ভালো লেগেছে। এত ভালো লেগেছে যে, তোমাকে বলেও শেষ করতে পারব না আমি। তাই তোমাকে আজ আসতে বলেছি।'

অনন্যা এবার আর কিছু বলে না। আবুল হাসানের কথা শুনে মনপ্রাণ সব ভরে যায় তার, তাই আবুল হাসান এরপর কী বলেন তা শোনার জন্যে কেবল কান পেতে থাকে।

আবুল হাসান যে থেমে থাকেন তা নয়, তিনি আবার বলেন, 'তিনটে কারণে তোমাকে আজ আমি এখানে ডেকেছি, জানো?'

অনন্যা খেতে খেতে মুখ তুলে খানিক তাকায়। 'একটা নয়, দুটোও নয়, তিনটে কারণে ডেকেছেন? তো বলুন শুনি, এক-দুই করে তিনটে কারণ শুনি।'

'প্রথমত, তোমার সঙ্গে খাব বলে ডেকেছি। দ্বিতীয়ত, তোমার সঙ্গে গল্প করব বলে ডেকেছি। সর্বোপরি, তোমাকে দেখার জন্যে মনটা খুব আনচান করছিল, সে জন্যে ডেকেছি। একটা প্রশ্ন করব মা তোমাকে?'

'হুঁ, করুন।'

'তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন, বলো তো?'

অনন্যা হাসে। 'এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?'

আবুল হাসান দেরি করেন না, বলেন, 'বেশ তো, করো।'

'আপনাকে আমার এত ভালো লাগে কেন, বলুন তো?'

ভালো লাগে, বড় ভালো লাগে আবুল হাসানের। তিনি তাই খেতে খেতেও হাসেন, হেসে বলেন, 'অনন্যা।'

'হুঁ।'

'তোমাকে গল্প বলব বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন। কিন্তু এখন আর বলছেন না।'

'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে।' আবুল হাসান বলেন, 'তাই গল্প মানে, আমার গল্প, আমার জীবনের গল্পই আজ বলব তোমাকে।'

অনন্যা বলে, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?'

'মনে করব কেন, তুমি বলো।'

'আচ্ছা, আপনার জীবনের গল্প আপনি আমাকে বলতে চান কেন?'

তখনই যে বলেন তা নয়। এক মুহূর্ত ভাবেন আবুল হাসান, তারপর বলেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমারও আসলে জানা নেই মা। তবে এটুকু বলতে পারি, তোমাকে দেখেই মনে হলো, তোমাকে বলা দরকার। প্রশ্ন করতেই পার, কেন এমন মনে হলো। বলেছি তো, এ প্রশ্নের উত্তর সত্যি আমার জানা নেই।'

আবুল হাসান থামেন। আবুল হাসান থামলেও অনন্যা এবার আর কিছু বলে না।

আবুল হাসানই আবার বলেন, 'একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব, বলতে পারবে মা ?'

'জিজ্ঞেস করুন, দেখি, পারি কি না।'

'সেদিন বলেছিলাম, আমার ঘরে থরে থরে সাজানো সব আছে। কিন্তু ঘর আলো করে যার থাকার কথা সে-ই শুধু নেই।' আবুল হাসান একটু থামেন, তার গলা একটু হলেও ধরে আসে। 'তার মানে, আমার ঘর আছে, ঘর আলো করার ঘরনী নেই। এবার তোমার জন্যে ধাঁধা হচ্ছে, আমি তো বিয়ে করেছিলাম, তা কটা করেছিলাম, বলো তো ? একটা, না দুটো, না তিনটে ?'

'আরে, এটা কোনো ধাঁধা হলো ?' অনন্যা খেতে খেতেও মুখ তুলে তাকায়। 'আপনি একটার বেশি বিয়ে করতে যাবেন কেন ? কোন দুঃখে আপনি দুটো-তিনটে বিয়ে করতে যাবেন !'

আবুল হাসান ম্লান হাসেন। 'তোমার ধারণা আমি একটাই বিয়ে করেছিলাম, না ?'

অনন্যা একটুও ভাবে না, দেরিও করে না, বলে, 'হ্যাঁ, তাই। আপনার মতো একজন ভালো মানুষ একটার বেশি বিয়ে করতে পারেনই না।'

'ধাঁধাটায় কিন্তু হেরে গেলে তুমি।'

'তার মানে আপনি...'

কথা শেষ করতে দেন না অনন্যাকে, আবুল হাসান বলেন, 'হ্যাঁ অনন্যা, হ্যাঁ। একটা নয়, আমি পরপর দুটো বিয়ে করেছি।'

'আপনার একজন স্ত্রীর কথা সেদিন...'

এবারও কথা শেষ করতে পারে না অনন্যা, আবুল হাসান থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'নেই, কেউ নেই।'

অনন্যার অবাক হওয়ার যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না, খাওয়া থামিয়ে দিয়ে সে খানিকক্ষণ আবুল হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'নেই মানে, কোথায় গেছেন !'

অনন্যার এ প্রশ্নের উত্তরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবুল হাসান বিড়বিড় করে বলেন, 'প্রথম স্ত্রী কোথায় গেছে জানি না।'

'দ্বিতীয় স্ত্রী কোথায় গেছেন ?'

'ইংল্যান্ড।'

'আর আসবেন না ?'

'না।'

অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। 'তার মানে, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে মুখে কিছু বলেন না, কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানান আবুল হাসান।

'উনি চলে গেলেন কেন ?'

খাওয়া থেমে গেছে অনেক আগেই, খাবার প্লেটের দিকে আর তাকিয়ে দেখাও নয়, রুমাল দিয়ে হাতমুখ মুছে আবুল হাসান একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'শুনবে ?'

অনন্যা বলে, 'শুনতেই তো চাই।'

'তো গোড়া থেকেই বলি, কী বলো।' আবুল হাসান বলেন, 'আমার সম্পর্কে শুনতে হলে, আমাকে পুরোপুরি

বুঝতে হলে আমার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সব প্রথম থেকেই শুনতে হবে তোমাকে অনন্যা।'

আবুল হাসান থামেন। আবুল হাসান থামলেও অনন্যা এবার আর কিছু বলে না। কেবল কান পেতে থাকে আবুল হাসান এরপর কী বলেন তা শুনবে বলে।

'মা।'

'বলুন।'

'সবকিছু শুনে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না তো, ঘৃণা করবে না তো মা, বলো ?'

অনন্যা বলে, 'না।'

'কী বলছ মা তুমি !' আবুল হাসানের চোখমুখ সব অন্তহীন খুশিতে ভরে ওঠে। 'ভুল করলেও ঘৃণা করবে না ? ঘৃণার কাজ করলেও ঘৃণা করবে না ?'

'বলেছি তো, না।' অনন্যা হাসে, হেসে বলে, 'আমার একশ ভাগ বিশ্বাস, আপনি মানুষ, তাই ভুল করতেও পারেন। ভুল করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আফসোসও করতে পারেন, কষ্টও পেতে পারেন। কিন্তু...'

'কিন্তু' পর্যন্ত বলে অনন্যাকে থেমে যেতে দেখে আবুল হাসান বলেন, 'কিন্তু কী মা, বলো ?'

'কিন্তু আপনার মতো একটা লোক কোনো ঘৃণার কাজ করতে পারেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না।' অনন্যা খাওয়া শেষ করে রুমাল দিয়ে হাত মোছে। 'আমার ধারণা, পরপর আপনার দুই স্ত্রীই আপনাকে ভুল বুঝেছেন।'

খুশি ! ধমনির প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে যেন অফুরন্ত খুশি ছড়িয়ে যায়। অফুরান খুশিতে আবুল হাসান হেসে বলেন, 'এত ভালো মা, এত ভালো তুমি ! দোয়া করি মা, তোমাকে আমি প্রাণখুলে দোয়া করি, তুমি বড় হও, অনেক বড় হও তুমি মা।'

'আমার কী ধারণা, জানেন ?'

'কী, মা ?'

'আপনাকে ভুল বুঝে আপনার স্ত্রীরা ভুলই করেছেন, মস্ত বড় ভুল করেছেন।' অনন্যা অনেকক্ষণ পর আবুল হাসানের চোখে চোখ রেখে তাকায়। 'কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না, আপনি দুটো বিয়ে করেছিলেন কেন ?'

'সেদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, এ আমার পরাজয়ের গল্প, বড় লজ্জার গল্প।' আবুল হাসানের চোখমুখের খুশি আবারও উবে যায়। বিষণ্ন দু চোখে এদিক-ওদিক তাকান তিনি। 'আমার জীবনের যাত্রাপথে পুরোটাই জয়ের, শুধু একটাই পরাজয়ের মা। সেটা কি তুমি শুনবে অনন্যা ?'

'শুনব।'

'আমি ভালোবেসেছিলাম, একজনকে বড় ভালোবেসেছিলাম।'

'তারপর ?' অনন্যা বলে, 'তিনি আপনাকে ভালোবাসেননি ?'

'বেসেছিল মা, বেসেছিল। খুব, খুব ভালোবেসেছিল।' আবুল হাসান বিষণ্ন কণ্ঠে বলেন, 'এত ভালোবেসেছিল যে, কী বলব তোমাকে !'

'তারপর ?' অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। 'তারপরও উনি চলে গেলেন কেন ?'

অনন্যার এ প্রশ্ন আচমকা ভেতরটা বুঝি একটু হলেও নাড়িয়ে দেয়। উত্তর কি নেই ? আছে। কিন্তু তারপরও

উত্তর দেন না, অনন্যার পুতুলের আদলে গড়া সুন্দর মুখের দিকে বিষণ্ন তাকিয়ে থাকেন।

আবুল হাসানকে চুপচাপ থাকতে দেখে অনন্যা আবারও বলে, 'আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ভালোই যদি বাসবেন তো আপনাকে এভাবে একা রেখে, নিজের ঘর ছেড়ে, সাজানো সংসার ফেলে চলে গেলেন কেন উনি ?'

'ভুল।'

'ভুল !' অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। 'কার ভুল ! কী ভুল, বলুন ?'

'তুমি বলেছিলে না, আমি ভুল করতে পারি না, ঘৃণার কোনো কাজ করতে পারি না।' একটুখানি থেমে, হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আবুল হাসান। 'হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। কিছুটা হলেও ভুল আমারও ছিল, জানো ? মানুষ তো। তাই ভুল করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেই ভুলটা যে এত বড় হবে, এত কষ্ট দেবে, দুঃখ দেবে, লণ্ডভণ্ড করে দেবে আমাকে, এ আমি ভাবতেও পারিনি মা।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এতক্ষণ কান্না সংবরণ করতে পারলেও আর পারেন না, কথা শেষ করেই এবার কেঁদে ফেলেন আবুল হাসান।

আবুল হাসানকে কাঁদতে দেখে অনন্যা হতবাক হয়ে তাকায়। 'আপনি কাঁদছেন !'

'হ্যাঁ মা।' আবুল হাসান দ্রুত রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নেন। 'কী করব বলো, মানুষ তো, যন্ত্র তো আর নই। তাই আনন্দে যেমন হাসি পায়, দুঃখেও তেমন কান্না এসে যায় মা; চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।'

আবুল হাসানের চোখে জল দেখে অনন্যার খারাপ লাগে। সে তাই বলে, 'শুনুন !'

আবুল হাসান চোখের জল মুছে বলেন, 'বলো মা।'

'কাঁদবেন না, প্লিজ, কাঁদবেন না আপনি।' অনন্যা বলে, 'আপনি কাঁদলে আমারও খারাপ লাগে, আমারও কান্না পায়, জানেন ? তার চে এক কাজ করুন, আপনি সেদিন কী ভুল করেছিলেন, বলুন ? উনি কেন আপনার মতো এমন একটা ভালো মানুষকে একা ফেলে রেখে চলে গেছেন, বলুন ?'

'ভুল আমি সেদিন সত্যি করেছিলাম মা।' দুটি ভেজা চোখে বড় অসহায়ের মতো তাকান আবুল হাসান। 'কে জানে, সেদিন মাথাটাথা আমার খারাপ হয়ে গিয়েছিল কি না ! নইলে এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে, এমন একটা কথা নিয়ে কেন গেলাম ? বলো, কেন গেলাম ওর কাছে ?'

আবুল হাসানের কথা বোঝার কথা নয়, বুঝতে পারেও না অনন্যা। সে তাই অবাক হয়ে তাকায়, কিছুই বলে না।

আবুল হাসান যে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন তা নয়, তিনি আবারও বলেন, 'কখন থেকে ভালোবেসে ফেলেছি, কীভাবে ভালোবেসে ফেলেছি জানি না। ঠিক তোমার মতো সুন্দর, অবিকল তোমার মতো দেখতে মানুষটাকে আমি ভালোবেসেছিলাম মা, খুব ভালোবেসেছিলাম। এত ভালোবেসেছিলাম যে তোমাকে বলেও বোঝাতে পারব না। একদিন এমন ছিল যে, আমার পুরো পৃথিবীটাই জুড়ে ছিল ও, শুধু ও, জানো মা ?'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী, সচরাচর যা হয় তা-ই।' টেবিলের ওপর রাখা ধবধবে সাদা রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছে আবুল হাসান বলেন, 'ও ঠিক তোমার মতো ছিল মা। ঠিক তোমার মতো মুখ, মায়াময়, একবার দেখলে সাধ মেটে না, বারবার দেখেও সাধ মেটে না। ঠিক এমনই একটা মুখ। ছবির মতো দেখতে, পুতুলের মতো দেখতে। লেখাপড়ায়ও ভালো ছিল, খুব ভালো ছিল। কিন্তু তারপরও আমার বাবা আমার এ পছন্দ, আমার এ ভালোবাসা মেনে নিতে পারলেন না।'

আবুল হাসান থামেন। আবুল হাসান থামতেই অনন্যা অবাক হয়ে বলে, 'কেন ? এত সুন্দর, এত ভালো, তবু

আপনার বাবা মেনে নিতে পারলেন না কেন ?'

'শুনবে মা ? শুনবে তুমি, কেন মেনে নিতে পারলেন না ?'

'বলুন।'

'আভিজাত্য, বংশমর্যাদা, অর্থ আর অহঙ্কার আমাদের দুজনের মাঝখানে একদিন ঠিকই কঠিন এক প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। বাবা মেনে নিতে পারলেন না, কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না মা।'

এক মুহূর্ত দেরি করে না অনন্যা, বলে, 'আপনার মা ? আপনার মা কী বললেন ?'

'আমার মা ছিলেন দুঃখী, বড় অভাগী। তার মতামতের কোনো মূল্য ছিল না মা।' আবারও রুমাল দিয়ে ভেজা চোখ মোছেন আবুল হাসান। 'তিনি তাই কিছুই বললেন না। দূর থেকে ছেলের দুঃখ দেখলেন আর কেবল কাঁদলেন।'

'তারপর ? তারপর কী হলো, বলুন ?'

'আমি ছুটে গেলাম আমার বাবার কাছে। আমার স্বপ্ন, আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা মেনে নিতে বললাম হাতজোড় করে।' একটু থামেন। একটু থেমে নিজের অতীত, নিজের ফেলে আসা জীবন বুঝি খানিকটা হলেও হাতড়ে বেড়ান তিনি। তারপর ভেজা চোখে তাকিয়ে অসহায়ের মতো বলেন, 'কিন্তু আমার বাবা ছিলেন অন্যরকম মানুষ, একেবারে আলাদা রকমের মানুষ। এতটা আলাদা রকমের ছিলেন যে, তোমাকে বলেও বোঝাতে পারব না মা।'

অনন্যার কিন্তু মন মানে না, সে তাই বলে, 'কী রকম, বলুন ?'

'তুমি জানো কি না জানি না, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না টাইপের এক ধরনের মানুষ আছে এই দুনিয়ায়। আমার বাবা ছিলেন ঠিক সে রকম এক মানুষ।' একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলে ডোবা দুটি চোখে তাকান আবুল হাসান। 'বাবা আমার কোনো কথা শুনতে চাইলেন না। তার কথা একটাই, এ হবার নয়।'

'আপনার স্বপ্ন, ভালোবাসা, আপনার চাওয়া-পাওয়া...'

কথা শেষ করতে দেন না অনন্যাকে, আবুল হাসান বলেন, 'না মা, এসব আবেগের কোনো দাম ছিল না আমার অর্থলোভী, ব্যবসায়ী বাবার কাছে।'

অনন্যার অবাক হওয়ার যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। সে অবাক হয়ে বলে, 'উনি কী বললেন ?'

'ওনার কথা একটাই, একটা হাভাতে ঘরের মেয়েকে আমি আমার পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে আনতে পারব না, কিছুতেই পারব না।'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'তারপর ? তারপর কী হলো ?'

'এরপর যা করেছি কিছুটা ভেবে করেছি, কিছুটা না ভেবে করেছি মা।'

'কী করেছেন ?'

'কোথা থেকে এত সাহস পেয়েছিলাম জানি না। কী করেছি, জানো ?' অনন্যার দিকে ভেজা চোখে তাকিয়ে আবুল হাসান বলেন, 'কাজি ডেকে লুকিয়ে বিয়ে করে ফেললাম।'

'বাহ্, বেশ করেছেন। এই তো, যাকে বলে পুরুষের মতো, বীরের মতো একটা কাজ করেছেন আপনি।'

আবুল হাসানের কথা অনন্যার ভালো লাগে।

'ভালোবাসবেন, অথচ ভালোবেসেও পালিয়ে যাবেন, তাকে ঘরে তুলে নেবেন না, এ আমি মেনে নিতে পারি

না। কিছুতেই মেনে নিতে পারি না, বুঝেছেন ? তাই আপনাকে বাহ্‌বা দিচ্ছি, আপনি ভালো কাজই করেছেন। যা করা দরকার ছিল, ঠিক তা-ই করেছেন আপনি। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।'

'এত তাড়াতাড়ি ধন্যবাদ দিচ্ছ মা ?'

'কী বলছেন আপনি !' অনন্যা অবাক হয়ে তাকায়। 'ধন্যবাদের কাজ করবেন অথচ ধন্যবাদ দেব না আমি !'

'না।'

অনন্যা অবাক হয়ে বলে, 'কেন !'

'কারণ, শেষ পর্যন্ত শুনলে তুমি আর আমাকে ধন্যবাদ দেবে না, তাই।'

অনন্যার বোঝার কথা নয়, সে তাই অবাক হয়ে তাকায়। 'কেন ? কী হয়েছে, বলুন তো ?'

'বড়লোকের ছেলে হলে যা হয়। ব্যাংকে নিজের নামে লাখ দেড়েক টাকা ছিল। মার কাছ থেকে চেয়ে নিলাম আরো পঞ্চাশ হাজার। মোট দু লাখ টাকা দিয়ে বিয়ে করে নতুন সংসার পাতলাম।'

'তারপর ?'

'দু লাখ টাকা শেষ হতে তো আর বেশি দিন লাগল না। তাই ওর অনেক অনুরোধে আবার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।' আবারও কাঁদেন, আবার চোখ মোছেন আবুল হাসান। "কিন্তু না, উনি আমার কোনো কথাই শুনলেন না। তার কথা একটাই, 'আমার বাড়িতে পা রাখতে হলে তোমাকে আমার পছন্দের মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে।' এরপর আমি যা করেছি, তা ভাবলে আজও আমি শিউরে উঠি, জানো মা ?"

'কী করেছেন, বলুন ?'

'বোকার মতো ওকে গিয়ে বললাম সব। ও শুনলও।' এবার আর নীরবে নয়, একটু হলেও শব্দ করেই কেঁদে ফেলেন আবুল হাসান। 'আমি বললাম, বাবার কথামতো, পছন্দমতো আমি যদি আর একটা বিয়ে করি, বাড়িতেও থাকি, তোমার কাছেও থাকি, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো, বলো ?'

'এ কথা কী করে বললেন আপনি ! কী করে বললেন, বলুন তো !'

'এত নির্মম, এত নিষ্ঠুর কথা ও সহ্য করতে পারবে না আমি বুঝতে পারিনি মা।' আবুল হাসানের দু চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। 'তারপর ও কী করেছে, জানো ?'

'কী ?'

আবুল হাসান তখনই যে বলেন তা নয়। একটু থামেন, থেমে এরপর কী বলবেন ভেতরে ভেতরে বুঝি গুছিয়ে নেন। তারপর বলেন, 'একটা চিরকুটে– তোমার নতুন ঘরনীর জন্যে আমার দোয়া থাকল, অনেক দোয়া, তুমি সুখী হও– লিখে রেখে সেই যে চলে গেল, আর ফেরেনি।'

অনন্যার যেন ত্বর সয় না, সে বলে, 'কোথায় ? কোথায় চলে গেছেন ?'

ডুকরে কেঁদে ওঠেন আবুল হাসান। 'জানি না মা, জানি না।'

'তারপর ? তারপর কী হলো ? ওনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি আপনার, না ?'

আবুল হাসান কেঁদে বলেন, 'না।'

'আপনি আবার বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করলেন ?'

আবুল হাসান অস্ফুট বলেন, 'হুঁ।'

‘বাহ্ পুরুষ, বাহ্ !’ উত্তেজনায়, আবেগে, রাগে, দুঃখে যেন কাঁপতে থাকে, থরথর করে কাঁপতে থাকে অনন্যা। ‘আপনাকে এখন আমার কী বলতে ইচ্ছে করছে, জানেন ?’

‘কী ?’

‘ছি ! ছি !’ রক্তের মতো টকটকে লাল দু চোখে তাকায় অনন্যা। ‘আপনাকে আমি ফেরেশতার মতো মানুষ ভেবেছিলাম। এখন তো দেখছি আপনি তা নন, একেবারেই তা নন।’

‘কিন্তু মা...’

কথা শেষ করতে দেয় না আবুল হাসানকে। অনন্যা বলে, ‘তো বলুন, এবার আপনার দ্বিতীয় ভালোবাসার গল্প বলুন। আশা করি এ গল্পটাও এ রকমই দুর্ধর্ষ, রোমহর্ষকই হবে।’

‘ঠাট্টা করছ মা ?’

‘না, ঠাট্টা নয়।’ অনন্যা অনেক দুঃখেও ম্লান হাসে। ‘প্রশংসা করছি, প্রশংসা।’

‘দ্বিতীয় বিয়েটা টেকেনি কেন, জানো ?’ আবুল হাসান প্রশ্ন করেন।

‘কেন ?’

‘বিয়ে করেছি, ভালোবাসতে পারিনি যে, তাই...’

‘বাহ্ সুন্দর, খুব সুন্দর !’

আবুল হাসান ভেজা চোখে তাকিয়ে একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘তোমার এখন আমাকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে, না ?’

‘জি, ঠিক ধরেছেন।’ অনন্যা ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। ‘তা সামান্য হলেও ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে বৈকি।’

আবারও কাঁদেন, আবারও চোখ মোছেন আবুল হাসান। ‘তোমাকে শেষমেশ একটা প্রশ্ন করব মা। উত্তর দেবে তো ?’

‘বলুন।’

‘আমি নাহয় বাবার কথামতো বিয়ের কথা বলে ভুলই করেছিলাম, কিন্তু ও এভাবে চলে গেল কেন ?’

‘আপনি বুঝতে পারছেন না, উনি চলে যাননি। আপনিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, স্রেফ তাড়িয়ে দিয়েছেন। কেন থাকবেন উনি ? কেন ? সতিনের সঙ্গে সংসার করার জন্যে ? সোহাগ, সংসার সব অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্যে ?’ রাগে, দুঃখে, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে, থরথর করে কাঁপতে থাকে অনন্যা। ‘একটা কথা বলি ?’

‘বলো।’

‘আপনি আসলে একটা নয়, পরপর দুটো ভুল করেছেন।’ রক্তলাল চোখে তাকিয়ে অনন্যা বলে, ‘ভালোবাসতে পারবেন না বুঝেও, জেনেও আপনি আবারও বিয়ে করলেন কেন, বলুন তো ? একটা নয়, এতে একের পর এক দুটো মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে গিয়ে দুটো জীবনই নষ্ট করেছেন আপনি, বুঝেছেন ?’

অনন্যার কথা ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। বুঝতে পারেন, জীবনে একটা নয়, দুটো ভুল, পরপর দুটো মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছেন তিনি। এখন দিনের পর দিন কড়ায়-গণ্ডায় সেই ভুলের মাশুল গুনছেন। কত দিন যে মাশুল গুনবেন, কত দিন এই একাকিত্ব, কষ্ট, ব্যথা বয়ে বেড়াবেন তাও কি জানেন ? না, জানেন না আবুল হাসান।

৫

আজ অনেক দিন পর এ বাড়িতে অনুষ্ঠান। বলতে গেলে অনেক দিন এ বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি, উৎসব হয়নি। ছেলে শামীম, চাকর-বাকর, মালি-দারোয়ান, আয়া-খানসামা আর ড্রাইভারকে নিয়ে মধ্য বনানীর একদম পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর এত বড় এই বাড়িতে এত বিত্ত, এত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আছেন, কিন্তু তারপরও মনে হয়, কী যেন নেই, কী যেন সত্যি হারিয়ে ফেলেছেন আবুল হাসান। সব থেকেও আজ কী নেই ? কী হারিয়ে ফেলেছেন ? এ প্রশ্নের উত্তর খুব ভালো করেই জানেন তিনি। ও আর কিছু নয়, ভালোবাসা। আজ সব আছে তার– অর্থ, বিত্ত, বিলাস। হাতের মুঠোয় রাজ্যের একরাশ প্রাচুর্য, তবু ইদানীং মনে হয়, কে যেন নেই, কী যেন সত্যি নেই তার। তাই তো, ভালোবাসাই যদি না থাকে, জীবন থেকে হারিয়ে যায় তো কী থাকে জীবনে !

সন্ধ্যায় বাড়িতে অনুষ্ঠান। লোকজন আসবে, খানাপিনা হবে। সকাল থেকেই তাই হাঁকডাক শুরু করেছেন আবুল হাসান। তার পৃথিবীজুড়ে এই এক ছেলেই তো, আর তো কেউ নেই। ছেলে তার মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে, ভালো রেজাল্ট করেছে; এ কথাটা, এ সুসংবাদটা জানাতে হবে না সবাইকে ? সে জন্যেই আসলে এই আয়োজন।

শামীম অবশ্য কদিন আগেও নিষেধই করেছে। বলেছে, 'কী দরকার বাবা এসবের, বলো তো ?'

শুনেই ফোঁস করে ওঠেন আবুল হাসান। 'দরকার নেই, না ?'

'বলছিলাম কি বাবা...'

কথা শেষ করতে পারে না শামীম, মুখ থেকে কথা কেড়ে নেন আবুল হাসান। 'একটা প্রশ্ন করব তোমাকে ?'

'বলো বাবা।'

'এত বড় এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে, প্রিয়জন বলতে তুমি ছাড়া আর কেউ কি আছে, বলো ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি হয় না শামীমের। সে বলে, 'না, বাবা।'

'সেই তুমি মাস্টার্স করেছ।'

'জি বাবা।'

'শুধু ফার্স্ট ক্লাস নয়, ফার্স্টও হয়েছ।'

শামীম আবারও বলে, 'জি বাবা।'

'এ খবরটা, মানে এ সুখবরটা আমি ঢেরা পিটিয়ে জানাব না সবাইকে, না ?' আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, 'তুমি শুধু আমার ছেলে নও, তুমি আমার পৃথিবী, বুঝেছ, পৃথিবী। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া' পর্যন্ত বলেই থেমে যান আবুল হাসান। আবুল হাসানকে কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখে শামীম অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'তা ছাড়া কী, বলো বাবা।'

'ভাবলাম, অনেক দিন কোনো অনুষ্ঠান হয় না এ বাড়িতে, আনন্দ-ফুর্তি হয় না, তাই...'

আবারও থেমে যান আবুল হাসান। আবুল হাসানকে থেমে যেতে দেখে এবার আর কিছু বলে না শামীম। আবুল হাসানই আবার বলেন, 'তা ছাড়াও একটা কারণ অবশ্য আছে, যা তুমি জানো না।'

'কারণ !' শামীম বাবার মুখের দিকে তাকায়। 'কী কারণ, বলো বাবা ?'

'ইদানীং আমার একটা বন্ধু জুটেছে।' আবুল হাসান হাসেন, মৃদু হেসে বলেন, 'খুব ভালো বন্ধু, বুঝেছ ?'

‘বন্ধু ! তোমার বন্ধু !’ শামীম যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বলে, তুমি তো তেমন কারো সঙ্গে মেলামেশা করো না। ব্যবসায়ী বন্ধুও তো তোমার তেমন কেউ নেই। ছোটবেলা থেকেই তো আমি তোমাকে দেখছি। তুমি একা থাক, একা চল। হঠাৎ এত দিন পর বন্ধু কোথায় পেলে তুমি !’

আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, ‘শুনলে কিন্তু অবাক হয়ে যাবে তুমি।’

‘ঠিক আছে, অবাক হলে হব, তুমি বলো শুনি।’

‘ওর সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হয়েছে, জানো ?’

শামীম বাবার কথা শুনে হাসে। ‘কোথায় দেখা হয়েছে তা আমি কী করে জানব, বলো ?’

‘ট্রেনে।’

শামীম হাসে, হেসে বলে, ‘ট্রেনে বন্ধুত্ব ?’

আবুল হাসান মুচকি হাসেন। ‘হুঁ, তাই। ট্রেনে বন্ধুত্ব।’

‘তো বলো, এত দিন পর সেই বন্ধুটা কে, যে তোমার হৃদয় জয় করল ?’

‘ও কিন্তু পুরুষ নয়, মেয়ে।’ আবুল হাসান আবারও হাসেন, হো-হো করে হাসেন। ‘মেয়ে মানে, যা-তা মেয়েও নয়। যাকে বলে, সুন্দরী, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী।’

আবুল হাসানের মুখে এত প্রশংসা শুনে, এত খুশি দেখে এতটাই অবাক হয়ে যায় যে কী বলবে তাও ভুলে যায় শামীম। শামীমকে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবুল হাসান হো-হো করে হাসেন, হেসে বলেন, ‘শামীম, এই শামীম।’

‘হুঁ।’

‘একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তোমাকে ?’

শামীম এতটাই হতবাক হয়ে গেছে যে, হ্যাঁ বা না কোনো কিছু আর বলতে পারে না সে। কেবল চেয়ে থাকে।

আবুল হাসান চুপ করে থাকার মানুষ নন, তিনি চুপ করে থাকেনও না। হো-হো করে একই রকম হেসে তিনি আবারও বলেন, ‘পারলে না তো ? ওর বয়স বাইশ অথবা তেইশ।’

বাইশ-তেইশ বছরের একটা মেয়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব একটা মানুষের বন্ধু হয় কী করে ! শামীম তাই বাবার এত উচ্ছ্বাস, এত খুশিভরা মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়, কিন্তু কিছুই বলে না।

শামীম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, কিছুই বলছে না দেখেও কোনো দিকেই কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আবুল হাসান একই রকম হো-হো করে প্রাণখুলে হাসেন, একই রকম বলেন, ‘ও কী পড়ে বলতে পারো শামীম ?’

অনেকক্ষণ পর মুখ খোলে শামীম, বলে, ‘আমি জানি না বাবা।’

‘মেডিকেলে। ঢাকা মেডিকেলে।’ আবুল হাসান বলেন, ‘তা ওর নাম শুনবে শামীম ?’

শামীম বলে, ‘বলো।’

‘অনন্যা।’ আবুল হাসান হাসেন। ‘তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না বাবা, ও সত্যি ওর নামের মতো অনন্যাই। রূপে, গুণে, শিক্ষায়, সব দিক দিয়েই অনন্যা।’

বাবার এত খুশির, এত প্রশংসার কোনো হেতু খুঁজে পায় না। হতবুদ্ধি শামীম তাই বাবার মুখের দিকে চেয়েই থাকে। এবারও কিছুই বলে না।

‘শোনো মাই বয়, আজকের অনুষ্ঠানে ওকেও আমি দাওয়াত করেছি।’ আবুল হাসান বলেন, ‘কী জানি, আসবে কি না, তবে আমি কুরিয়ার সার্ভিসে দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছি।’

শামীম অবাক হয়। ‘দাওয়াত দিলে আসবে না কেন?’

‘হয়তো কোনো জরুরি কাজ পড়ে গেল আর এল না, নয়তো ইচ্ছে করেই এল না।’ আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, ‘তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, দেখবে ভালো মেয়ে, খুব ভালো মেয়ে। এত ভালো যে আমি বলেও শেষ করতে পারব না শামীম।’

আবুল হাসানের মুখে এত প্রশংসা শুনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায় শামীম। ‘বাবা, শোনো।’ কোথাকার কোন একটা মেয়ে, তার সম্পর্কে এত কথা বলতে ভালো লাগে না। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে সে এবার বলে, ‘কত লোক আসবে, বলো তো?’

‘তিনশ।’

‘তিনশ ! এত লোক !’ শামীম বলে, ‘এত লোককে বলার কী দরকার ছিল বাবা?’

‘ছি শামীম, কী বলছ !’ আবুল হাসান ছেলের কথা শুনে হো-হো করে হাসেন। ‘আমার তো ইচ্ছে ছিল তিনশ নয়, পুরো ঢাকা শহরটাকেই দাওয়াত করি।’

শামীম আবুল হাসানের এত খুশির কারণ কী বুঝতে পারে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তার মনে, এত খুশির সবটাই কি তার রেজাল্টের জন্যে, নাকি অনন্যা নামের একজন আজ এ বাড়িতে আসবে সে কারণেও !

সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল অপেক্ষা করতে হয় তাকে, সন্ধ্যা হতে না হতেই এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যায় সে। সন্ধ্যা নাগাদ অতিথিরা একে একে হাসিমুখে কেউ রঙবেরঙের বাহারি ফুল হাতে, কেউবা শামীমের জন্যে এটা-ওটা উপহার হাতে, কেউবা খালি হতে আসতে থাকেন। কিন্তু কই, আবুল হাসানের মুখে হাসি কই ! শামীম দেখে, আবুল হাসান শুধু একবার-দুবার নয়, বারেবারে হাতঘড়ি দেখছেন আর পথের পানে তাকাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে বিষণ্ন হয়ে উঠছে তার চোখমুখ। এক-দুজন করে অতিথিরা মোটামুটি প্রায় সবাই এসে গেছেন। কিন্তু আবুল হাসানের পথের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখা একটুও কমে না, বরং আরো বেড়ে যায়। এত মানুষ, এত আনন্দ, এত হইচই, কিন্তু শামীম দেখে আবুল হাসান খুশি হওয়া কি, চোখমুখ সব কেমন যেন কালো করে আছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না শামীমের, বিশেষ কারো আসতে দেরি হওয়ায় তার এ অবস্থা। সেই বিশেষ মানুষটা কে তাও বুঝতে পারে না তা নয়, সে বাবার ইদানীং জোটা বন্ধু, অনন্যা।

শামীম দেখে হঠাৎ করে অফুরন্ত খুশি এসে ঠিকরে পড়েছে আবুল হাসানের চোখেমুখে। একজনকে দেখে তিনি শুধু এগিয়ে যান না, বলা যায় মুখে একগাল হাসি হেসে ছুটে যান। ছুটে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, ‘অনন্যা, এই অনন্যা, এত দেরি করলে কেন তুমি, বলো তো? আমি তো ভেবেছিলাম...’

কথা শেষ করতে দেয় না আবুল হাসানকে, অনন্যা বলে, ‘কী ভেবেছিলেন? আমি আসব না?’

আবুল হাসান হাসেন, হো-হো করে হাসেন। ‘হ্যাঁ, ভেবেছিলাম। তা-ই ভেবেছিলাম।’

‘কী করে ভাবলেন আমি আসব না?’ অনন্যা আবুল হাসানের চোখে চোখ রেখে তাকায়। ‘আপনি ডেকেছেন, আর আমি আসব না, না?’

‘বাদ দাও তো এসব, বাদ দাও।’ আবুল হাসান বলেন, ‘এসো মা, এসো, একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।’

‘কে?’

‘এসো না, এসো।’

শামীমের সামনে এসে দুজন দাঁড়ায়। ব্যস, চমকে ওঠে শামীম, ভয়ানক চমকে ওঠে। আরে, এ তো সেই, যাকে সেদিন বাঁশিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাঁধতে দেখেছে সে। যার বাঁশির সুর শুনে, যাকে দেখে তার শুধু ভালো লেগেছে বললে কম বলা হবে, বলা যায় ধমনির প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে সেই মুখ। আরে, ছবির মতো মুখের সেই সুন্দর মেয়েটাই কিনা বাবার বন্ধু ! বাবার এত প্রিয় ! এও হয় ! হতে পারে !

'শামীম।' আবুল হাসান বলেন, 'এ হচ্ছে...'

আবুল হাসানের কথা শুনেই হুঁশ হয়, তাই কথা শেষ করতে দেয় না আবুল হাসানকে। শামীম বলে, 'তোমার বন্ধু, তাই না বাবা ?'

'শুধু বন্ধু নয়।' আবুল হাসান হো-হো করে হাসেন।

শামীম অবাক হয়ে আবুল হাসানের মুখের দিকে তাকায়। 'বন্ধু নয় তো কী ?'

'উনি আমার বাবার মতো।' শামীমের কথার পিঠে আবুল হাসান কিছু বলার আগেই অনন্যা হেসে বলে, 'বাবার মতো মানে তো বাবাই, কী বলেন ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় কী বলবে না বলবে বুঝতে না পেরে হকচকিত শামীম বোকার মতো বলে, 'হুঁ।'

'অনন্যা।'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'বলুন।'

'ও কে, বলো তো ?' আবুল হাসান সামনে দাঁড়ানো শামীমকে হাতের ইশারায় দেখায়।

অনন্যা চেনে নাকি যে বলবে ! সে তাই মাথা নাড়ে।

'শামীম।' আবুল হাসান বলেন, 'মানে যার জন্যে আজকের এই আয়োজন এ-ই সেই শামীম। তো তোমায় একটা প্রশ্ন করি ?'

'করুন।'

'শামীমের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, বলো তো ?'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'জানি না। দাওয়াতপত্রেও স্পষ্ট লেখা ছিল না। লেখা ছিল আমার শামীম মাস্টার্সে শুধু ফার্স্ট ক্লাসই পায়নি, ফার্স্টও হয়েছে। তাই তার সাফল্যে অনুষ্ঠান।'

'পারলে না তো। পারলে না তো অনন্যা।' আবুল হাসান হো-হো করে হাসেন। 'তো আমি বলি ?'

'বলুন।'

'ও আমার ছেলে, বুঝেছ ?'

'ছেলে !' অনন্যা যেন আকাশ থেকে পড়ে। 'আপনার ছেলে !'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে।'

'কিন্তু...'

'আর কোনো কিন্তু নয় অনন্যা।' আবুল হাসান বলেন, 'তোমরা দুজন গল্প করো। আমি ওদিকটায় একটু দেখি, কেমন ?'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ান না, চলে যান আবুল হাসান।

‘আপনি বাঁশি বাজান ?’

অনন্যা শামীমের কথা শুনে চকিতে মুখ তুলে তাকায়।

শামীম হাসে, হেসে বলে, ‘এত সুন্দর আপনি কী করে বাজান, বলুন তো ?’

‘আমি বাঁশি বাজাতে জানি, কী করে জানেন আপনি !’ হতবাক হয়ে যায় অনন্যা, হতবাক হয়ে শামীমের মুখের দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে বলে, ‘আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি বাঁশি বাজাই, কী করে জানেন আপনি !’

‘শুধু বাঁশি বাজান বললে ভুল বলা হবে, খুব, খুব ভালো বাঁশি বাজান আপনি।’

‘ভালো-মন্দ বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক, আমি বাঁশি বাজাই।’ বিস্মিত অনন্যা একই রকম চেয়ে থেকে বলে, ‘কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না, আমি যে বাঁশি বাজাই এটা আপনি জানেন কী করে !’

অনন্যাকে অবাক হতে দেখে শামীম হাসে, কিছু বলে না।

অনন্যাই আবার বলে, ‘কী হলো, বললেন না, আমি যে বাঁশি বাজাতে জানি এটা আপনি কী করে জানেন ?’

শামীম হেসে বলে, ‘আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে– রবীন্দ্রসঙ্গীতটা...’

‘আরে, আপনি দেখছি সবই একেবারে ঠিক ঠিক বলছেন !’ অনন্যা যেন থ হয়ে যায়। ‘সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি কোথাও আমার বাঁশি বাজানো শুনেছেন ?’

‘জি, শুনেছি।’ শামীম হাসে। ‘শুধু শুনেছি বললে কম বলা হবে। শুনে মুগ্ধ হয়েছি, হতবাক হয়েছি।’

‘কোথায় ? কোথায় শুনেছেন, বলুন তো ?’

‘জয়দেবপুর।’

‘জয়দেবপুর মানে !’

‘জয়দেবপুর ন্যাশনাল পার্কে কদিন আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, মানে আপনারা পিকনিক করতে গিয়েছিলেন ?’

‘জি, গিয়েছিলাম তো।’

‘সেখানে বাঁশি বাজিয়েছেন আপনি।’

এতক্ষণে বুঝতে পারে অনন্যা। ‘সেখানে ছিলেন আপনি ?’

‘শামীমও হাসে, ‘শুধু ছিলাম না, অনেকের মতো আমিও মুগ্ধ হয়ে আপনার বাঁশি শুনেছি।’

প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে। অনন্যা তাই হাসে। ‘আপনি বাঁশি শুনতে ভালোবাসেন ?’

‘হুঁ, বাসি। খুব ভালোবাসি।’ শামীম বলে, ‘আপনি জানেন না, কী সুন্দর বাজিয়েছেন আপনি ! সবাইকে তো একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, জানেন ?’

‘ধ্যাৎ, বাড়িয়ে বলছেন আপনি।’ শামীমের কথা ভালো লাগলেও অনন্যা লজ্জা পায়। লজ্জা পেয়ে কথা ঘোরানোর জন্যে হলেও বলে, ‘বাঁশি শুনতে ভালো লাগে বুঝলাম। কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো এ মানুষটার আর কী কী ভালো লাগে বা পছন্দ, বলুন শুনি ?’

‘আমি লেখাপড়ায় ভালো কে বলেছে আপনাকে ?’

‘আজকের এই আয়োজন বলেছে।’ মিষ্টি হাসে অনন্যা। ‘আজকের এ আয়োজন কিসের জন্যে, বলুন ?’

শামীম এ প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলে না। লজ্জা পায়, লজ্জা পেয়ে কেবল মাথা নিচু করে।

‘তো বললেন না, আর কী কী পছন্দ আপনার ?’

‘শুনবেন ?’

‘শুনতেই তো চাই।’

‘প্রকৃতি।’

‘প্রকৃতি !’

‘হ্যাঁ, প্রকৃতি।’ শামীম বলে, ‘অরণ্য, অরণ্যের সবুজ, দিগন্ত-বিস্তৃত ধানক্ষেত, খোলা আকাশ– এসব আমার খুব প্রিয়, জানেন ?’

‘সত্যি ? সত্যি বলছেন আপনি ?’ অপরিসীম খুশিতে যেন ঝলমল করে ওঠে অনন্যা। ‘আমারও। জানেন, প্রকৃতি, অবারিত সবুজ, নদী, পাহাড়, অরণ্য– এসব আমারও খুব প্রিয়। এত প্রিয় যে কী বলব...’

‘আর বলতে হবে না।’ শামীম অনন্যাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ‘প্রকৃতি, প্রকৃতির সবুজ যে আপনার খুব প্রিয়, এ আমি আপনার চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারছি।’

‘অরণ্যের কাছে, কলকল করে বয়ে চলা নদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কী ভালো যে লাগে, আপনাকে তা বলে বোঝাতে পারব না আমি।’ অন্তহীন খুশিতে ঝলমল করে অনন্যা বলে, ‘ইচ্ছে হয় ছুটে যাই। যখন-তখন ছুটে যাই।’

‘যান না ?’

‘হুঁ, যাই। তবে ঢাকায় থাকলে যাওয়া হয় না।’

‘কেন ?’

‘বা রে, কার সঙ্গে যাব !’

অনন্যার কথা শামীম তখনো বোঝে না, তাই বলে, ‘মানে ! কার সঙ্গে যাবেন মানে !’

শামীম যে বুঝতে পারছে না এটা বুঝতে পেরে অনন্যা হাসে। ‘বুঝতে পারছেন না ?’

শামীম কিছু বলে না, শুধু মাথা নাড়ে।

অনন্যা হাসে, হেসে বলে, ‘আমি মেয়েমানুষ। অরণ্যের কাছে যাওয়া মানে তো সাভার কিংবা জয়দেবপুর যাওয়া। অদ্দূর আমি একা কী করে যাব, বলুন তো ?’

‘একটা কথা বলব ?’

অনন্যা বলে, ‘বলুন।’

‘যদি বলি আমার সঙ্গে চলুন, যাবেন আপনি ? যাবেন ?’

থ হয়ে যায় অনন্যা। থ হয়ে শামীমের মুখের দিকে নির্বাক চেয়ে থাকে, কিছুই বলে না।

‘যদিও আমার সঙ্গে আপনাকে বেড়াতে যেতে বলার কোনো অধিকার আমার নেই, তবু বলছিলাম কি, চলুন না দুজনে।’ সারা জীবন যার একটা মেয়েবন্ধুও নেই, সেই শামীম কোথা থেকে এত সাহস পায়, কী করে

আচমকা এ কথা বলে, নিজেও বুঝতে পারে না। 'চলুন না, রোজ না গেলেও বন্ধের দিন কিংবা মাঝে মাঝে দুজনে কোথাও ঘুরতে বেড়াতে যাই !'

হতবাক অনন্যা অনেকক্ষণ পর বলে, 'কী বললেন !'

'ভালো লাগবে, জানেন ?' শামীমের কোনো দিকে খেয়াল নেই, হুঁশ নেই। হঠাৎ পরিচয় হওয়া একটা মেয়েকে এভাবে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলাটা ঠিক নয়, এটাও বুঝতে পারে না সে। 'কেন লাগবে জানি না, তবে আপনার সঙ্গে গেলে আমার ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে, জানেন ?'

শামীমের এ আহ্বানে কী ছিল কে জানে, অনন্যা মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত ভাবে, ভেবে বলে, 'আমি যাব।'

না, আকাশের চাঁদ আচমকা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও শামীম এত খুশি হতো না। অনন্যার কথা শুনে খুশিতে যেন লাফিয়ে ওঠে সে। 'সত্যি বলছেন ! সত্যি বলছেন আপনি !'

অনন্যা কেন যেন মাথা তোলে না। মাথা নিচু করে বলে, 'আমি পারতপক্ষে মিথ্যে বলি না, বলা পছন্দও করি না।'

'যাবেন ? যাবেন আপনি আমার সঙ্গে ?'

'তা কবে যাব আমরা ?'

অন্তহীন খুশিতে কী বলবে, কী করবে কিছুই আর ভেবে পায় না শামীম। পুতুলের মতো, পরীর মতো যে মেয়েটার বাঁশি শুনে মুগ্ধ হয়ে আছে, যাকে প্রথম দেখাতেই শুধু ভালো নয়, খুব ভালো লেগেছে, সে তার সঙ্গে বেড়াতে যাবে ? এর চে আনন্দের, এর চে খুশির আর কী আছে। ধরেই নিয়েছিল, অনন্যা রাজি হবে না। অনন্যা রাজি হওয়ায় ভ্যাবাচেকা খেয়ে কী বলবে আর ভেবে পায় না, তাই চুপ করেই থাকে।

অনন্যা অনেকক্ষণ পর এবার মুখ তুলে তাকায়। 'কী হলো, চুপ করে আছেন যে ?'

বোকার মতো বলে ফেলেছে। কিন্তু অনন্যা বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজি হয়ে যাওয়ার পরই ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় শামীম। খেই হারিয়ে ফেলে তাই এবারও কিছুই বলে না, পলকহীন চোখে বোকার মতো অনন্যার মুখের দিকে কেবল চেয়ে থাকে সে।

তাই বলে অনন্যা যে থেমে থাকে তা নয়, সে একই রকম বলে, 'তো বলুন, কবে যাবেন, বলুন ?'

'আপনিই নাহয় বলুন।' আর চুপ করে থাকা ঠিক নয় ভেবে এবার মুখ খোলে শামীম। 'আপনি যেদিন বলবেন, সেদিনই।'

অনন্যা মাথা নিচু করে একটু ভাবে, ভেবে বলে, 'পরশু শুক্রবার, ছুটির দিন। আপনার কোনো কাজ নেই তো ?'

'কখন ?'

'দুপুরের পর।' অনন্যা বলে, 'এই ধরুন চারটা সাড়ে চারটা নাগাদ ?'

'সারা দিনই অবশ্য কোনো কাজ নেই। পরীক্ষা তো শেষ, রেজাল্টও বের হয়ে গেছে। সারা দিনই তাই কাজ নেই তো খৈ ভাজার মতো এদিক-ওদিক ঘোরা, নইলে বাড়িতে বসে বই পড়া, গান শোনা কিংবা হাই তোলা।' শামীম হাসে, হেসে বলে, 'তবু প্রশ্ন করে জেনে নিলাম, কখন যাব আমরা। তা চারটার সময় আপনার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হবে, তা তো বললেন না ?'

'যদি বলি, আপনি সাভার স্মৃতিসৌধে চলে আসবেন, আপনার আপত্তি নেই তো ?'

'হ্যাঁ, আছে। আপত্তি আছে।'

চকিতে তাকায় অনন্যা। 'আপত্তি আছে !'

'কেন, আমরা ঢাকা থেকে রওনা দিতে পারি না ?'

অনন্যা শামীমের কথা শুনে হাসে। 'তো আপনিই বলুন, কোথায় দেখা হবে আমাদের ?'

'আমাদের বাড়িতে আসবেন ?' শামীম বলে, 'এখান থেকেই নাহয় দুজনে...'

কথা শেষ করতে দেয় না, মুখ থেকে কথা কেড়ে নেয় অনন্যা। 'বেশ তো, চারটার মধ্যেই আমি চলে আসব।'

'আমি কিন্তু আপনার অপেক্ষায় থাকব।'

'আপনার কি মনে হয়, আমি কথা দিয়েও আসব না ?' মাথা নিচু করে ছিল, কথা বলতে বলতে মাথা তুলে এক পলক তাকায় অনন্যা। 'বলেছি তো, আমি মিথ্যে বলি না। এ শিক্ষা আমি কার কাছ থেকে পেয়েছি, জানেন ?'

শামীম দেরি করে না, বলে, 'কার কাছ থেকে, বলুন ?'

'আমার মার কাছ থেকে।'

'মাকে খুব ভালোবাসেন আপনি, না ?'

'আপনার মা নেই তো, আপনি জানেন না। দুনিয়ার সবাই মাকে ভালোবাসে। তা ছাড়া এ পৃথিবীতে এক মা ছাড়া আমার আর কেউ নেইও।'

'কী বলছেন আপনি !' শামীম অবাক হয়ে তাকায়। 'আর কেউ নেই মানে ?'

'নেই মানে, নেই।' অনন্যা ম্লান হাসে। 'আত্মীয় বলুন, স্বজন বলুন, আনন্দে আনন্দিত হওয়ার মতো, দুঃখে দুঃখী হওয়ার মতো, কাঁদার মতো, হাসার মতো ওই এক মা ছাড়া আর আসলে এই দুনিয়ায় কেউ নেই আমার।'

'আমারও...'

কথা শেষ করতে দেয় না শামীমকে, অনন্যা থামিয়ে দেয়। 'জানি। বাবা ছাড়া কেউ নেই।'

'তার মানে আমাদের একটা মিল আছে।'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'কী মিল ?'

শামীম হাসে, হেসে বলে, 'আমাদের দুজনেরই বাবা কিংবা মা ছাড়া আর কেউ নেই।'

অনেকক্ষণ পর অনন্যা একটু হলেও হাসে, হেসে বেল, 'হুঁ, ঠিক।'

'আমাদের আর কী কী মিল আছে, বলুন তো ?'

'মিল না বলে, অমিল বলি ?'

শামীম হেসে বলে, 'অমিল ?'

'আপনারা বড়লোক, খুব বড়লোক।' অনন্যা হাসে, হেসে বলে, 'আর আমরা ? আমরা গরিব।'

'হয়েছে, হয়েছে। আজ আনন্দের দিন। আজ আর অত ধনী-গরিব বলতে হবে না।'

'এই যে মা, তুমি এখানে ?' আবুল হাসান এ সময় আবার হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসেন। 'এসো মা, এসো। কিছু মুখে দেবে, এসো।'

আর কথা বাড়ায় না, আবুল হাসানের পেছন পেছন দুজনে বাড়ির পেছনের সবুজ লনে শামিয়ানা টানানো আলো-ঝলমল প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে অনন্যা শামীমের হাতে রঙিন কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট গুঁজে দিয়ে হাসে, হেসে বলে, 'শুভেচ্ছা।'

'আপনাকেও শুভেচ্ছা।' শামীম বলে, 'তা কী এটা ?'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'গল্পগুচ্ছ। জানি, এ আপনার পড়া। তবু এর চে ভালো কোনো উপহার নজরে পড়েনি যে !'

শামীম হাসে, হেসে বলে, 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের চে বড় কোনো উপহার, দামি কোনো উপহার হয় নাকি যে নজরে পড়বে ?'

৬

কোথাও কোনো ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে না গেলে রোজ দুপুরে একটা-দেড়টা নাগাদ কমসে কম ঘণ্টাখানেকের জন্যে আবুল হাসান বাড়িতে আসবেনই। বাড়িতে এসে কাপড়-চোপড় পাল্টে, বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে ডালভাত যা হোক মুখে দেয়ার এ নিয়মটা তার অনেক দিনের, সেই বাবার আমল থেকেই। হাই ব্লাড প্রেসার, হার্টের ট্রাব্‌ল দুটোই আছে। তাই খাওয়া-দাওয়াও করেন একদম মেপে মেপে, বাছবিচার করে। খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরের ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দশ কি পনের মিনিট দু চোখ বুজে বিশ্রাম নেয়ার অভ্যাসটাও এক-দু দিনের নয় তার, বহুদিনের। আজও বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় নীচে মেয়েলি হাসি শুনে স্বভাবতই ভাবেন, আরে, কে হাসছে ! এ বাড়িতে তো কোনো মেয়ে নেই, তো হাসছে কে ! কখন চোখ খোলেন, কখন ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ান নিজেও জানেন না।

এরপর যা দেখেন তা দেখার জন্যে বুঝি একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। অনন্যা শামীমের সঙ্গে সোফায় মুখোমুখি বসে গল্প করছে। শামীম হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে, বোঝাচ্ছে, আর অনন্যা হাসছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বিস্মিত হন আবুল হাসান। দূর থেকে চোখ বড় বড় করে দেখেন আর ভাবেন তিনি, এ সেই হাঁটি হাঁটি পা পা করা তার শামীম তো, যাকে সেই ছোট্টবেলায় দোলনায় দোল খাইয়েছেন, বড় করেছেন ? এত দিন ধরে এত কাছে থেকে এত দেখা ছেলেকেই যেন আর চিনতে পারেন না তিনি। এ যেন সেই শামীম নয়, অন্য শামীম। একেবারে অন্য এক শামীম। ছেলে বড় হয়েছে জানতেন, কিন্তু ছেলে এতটাই বড় হয়েছে, এতটাই লায়েক হয়েছে তা ভাবেননি। হঠাৎ করেই বুঝতে পারেন আবুল হাসান, হ্যাঁ, তাই তো, ছেলে তো তার বড় হয়েছে। তার তো চোখে কাউকে ভালো লাগতেই পারে।

নিজের অজান্তেই কখন ধীরে ধীরে এক পা দু পা করে আবারও নিজের শোবার ঘরে এসে ঢোকেন, ইজি চেয়ারে এসে বসেন বলতেও পারবেন না। অনেক দিন পর এই প্রথম উপলব্ধি করেন তিনি, ভেতরে ঝড় উঠেছে তার, টালমাটাল এক ঝড়। শামীম আর অনন্যার এত হাসি দেখে, খুশি দেখে, কথাবার্তা শুনে বহুদিন আগের ফেলে আসা জীবন, জীবনের খুশি, দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়া, সব আচমকা চোখের সামনে যেন এক এক করে ভেসে ওঠে তার।

এমন দিন তো তারও ছিল, এমন খুশির দিন, এমন স্বপ্নের দিন। কিন্তু সুখের সে দিনগুলো, স্বপ্নের সে দিনগুলো ঝড়ের বেগে এল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার চলে গেল কেন, বুঝতেও পারলেন না তিনি। একদিনের কথা আজও মনে আছে তার। লুকিয়ে বিয়ে করার পর তার লোমশ বুকে মাথা রেখে একদিন ও বলেছিল, 'তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো, বলো না ?' উত্তর দিতে সেদিন একটুও ভাবেননি, দেরিও করেননি আবুল হাসান। মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'না, কক্ষনো না, কোনো দিন না।' কিন্তু তারপর ? কে কাকে ছেড়ে গেল ? আর একটা বিয়ের কথা বলে তিনি নাহয় ভুলই করেছিলেন সেদিন, কিন্তু ও কেন ভুল করল ? ও কেন এত ভালোবাসা, থরে থরে সাজানো তার ভালোবাসার সংসার ফেলে চলে গেল ?

তারপর থেকে শুধু খোঁজা, সারা জীবন ধরে কেবল খোঁজাখুঁজি। সমস্ত জীবন ধরে একটা মুখকে, একটা প্রিয়

মুখকে কেউ খোঁজে ? কেউ খুঁজুক না খুঁজুক তিনি তো খুঁজেছেন, সব হারানোর বিষণ্নতা নিয়ে তিনি তো খুঁজে তোলপাড় করেছেন। কিন্তু না, পাননি। কোথায় যে মিলিয়ে গেল সেই মুখটা ! বেঁচে আছে তো ? ভাবতে গিয়েই বুকের ভেতর সমুদ্র-সমান এক কষ্টের ঢেউ এসে যেন আছড়ে পড়ে।

বাইরে গাড়ির শব্দ শুনতে পান। বুঝতে পারেন, বেরিয়ে গেল ওরা। কোথায় গেল দুজনে ? লং ড্রাইভে ? হবে হয়তো। কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে শামীমের চোখে অন্তহীন খুশির রোশনাই জ্বলতে দেখেছেন। শামীমের চোখে এত আলো, এত খুশি আর কখনো দেখেছেন মনে পড়ে না আবুল হাসানের। তাহলে কি...? ভাবতে গিয়েই কেঁপে ওঠেন, ভয়ানক কেঁপে ওঠেন আবুল হাসান।

ঠিক তখনই টেলিফোন বাজে। টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে আবদুল হাকিম চৌধুরী, যিনি শুধু আজ তার সমকক্ষ ধনী নন, তার চে অনেক বড় ব্যবসায়ী, ধনী, তিনি সালাম দিয়েই বললেন, 'কেমন আছেন হাসান সাহেব ?'

আবুল হাসানও সালামের জবাব দেন, সালামের জবাব দিয়ে বলেন, 'ভালো। তা আপনি ভালো তো ?'

'ভালো ছিলাম।'

আবুল হাসান স্বভাবতই অবাক হন। 'ছিলাম মানে !'

'ছিলাম মানে, অতীত কাল। পাস্ট টেন্স।' আবদুল হাকিম চৌধুরী হো-হো করে হাসেন। 'বুঝতে পারছেন না তো ?'

আবুল হাসান বলেন, 'না।'

'এবার কটা প্রশ্ন করি ?'

'করুন।'

'সেদিন সন্ধ্যায় সস্ত্রীক আমরা আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম কি না, বলুন ?'

'জি, এসেছিলেন।'

'সেদিন কী উপলক্ষে পার্টি ছিল, বলুন ?'

'আমার ছেলের...'

কথা শেষ করতে পারেন না আবুল হাসান, হো-হো করে হেসে আবদুল হাকিম চৌধুরী বলেন, 'তার মানে আপনার একটা ছেলে আছে ?'

'জি, আছে।'

'সে ব্রিলিয়ান্ট, খুব ব্রিলিয়ান্ট ?'

আবুল হাসান চোধুরী অস্ফুট বলেন, 'জি।'

'এবার বলুন, আমার যে একটা সুন্দরী, অতি সুন্দরী, শিক্ষিতা, অতি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মেয়ে আছে তা কি আপনি জানেন ?'

আবুল হাসান দেরি করেন না, বলেন, 'জি, জানি।'

'তাকে কি আপনি দেখেছেন, বলুন ?'

'দেখেছি মানে !' টেলিফোনের এ-প্রান্ত থেকে আবুল হাসান বলেন, 'কতবার দেখেছি তার হিসেব আছে নাকি !'

‘আমার সেই গুণবতী মেয়েটার নাম জানেন ?’

‘জানি।’

‘কী ?’

‘নাজমা।’

‘গুড, ভেরি গুড।’ আবদুল হাকিম চৌধুরী হাসেন, হেসে বলেন, ‘এবার ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নয়, সরাসরি কথাটা বলি, কেমন ?

আবুল হাসান দেরি করেন না, বলেন, ‘বলুন।’

‘আপনার শামীমকে আমার পছন্দ হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে।’ আবদুল হাকিম চৌধুরী একটু হলেও থামেন, থেমে বলেন, ‘এবার বলুন, আমার নাজমাকে আপনার কেমন লাগে ?’

আবদুল হাকিম চৌধুরী কী বলতে চান বুঝতে পারেন আবুল হাসান। তিনি তাই অস্ফুট স্বরে বলেন, ‘ভালো।’

আবদুল হাকিম চৌধুরী হাসেন, হো-হো করে হাসেন। ‘শুধু ভালো বললে তো হবে না, খুব ভালো কি না বলুন ?’

‘জি, ভালো। খুব ভালো।’

ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নয়, এবার ঠিকই সরাসরি কথাটা বলেন আবদুল হাকিম চৌধুরী, ‘এবার বলুন, আমার মেয়েটাকে আপনি আপনার পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে নেবেন কি না, বলুন ?’

আবুল হাসানও ব্যবসায়ী মানুষ, ঝানু মানুষ। আবদুল হাকিম চৌধুরী কী বলতে চান তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাই কথাটা শুনে অবাক হন না। তবে তখনই যে কিছু বলেন তা নয়। আবদুল হাকিম চৌধুরী এরপর কী বলেন তা শোনার জন্যে কেবল কান পেতে থাকেন।

আবদুল হাকিম চৌধুরী এমনিতেই বেশি কথা বলা মানুষ। বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ‘লক্ষ্মী মেয়ে, বুঝলেন, খুব লক্ষ্মী মেয়ে আমার। তো বলুন, কবে আসবেন, কবে পাকা কথা হবে, বলুন ?’

‘ছেলের মতামতটা...’

মুখের কথা শেষ করতে দেন না আবদুল হাকিম চৌধুরী, বলেন, ‘ঠিক বলেছেন, একশবার ঠিক বলেছেন। শিক্ষিত ছেলে, আজকালকার ছেলে, মতামত তো নিতেই হবে, কী বলেন ?’

ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া, যখন-তখন ফুটফাট ইংরেজি বলা, জিন্সের প্যান্ট পরা আবদুল হাকিম চৌধুরীর হাইফাই চলাফেরা করা মেয়েটাকে একদম পছন্দ নয় আবুল হাসানের। আবদুল হাকিম চৌধুরীর কথা শুনে তিনি তাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। ‘তো এ কথাই থাকল। ছেলের মতামত নিয়েই নাহয় আমি আপনাকে জানাব, কেমন ?’

আবুল হাসানের কথা শুনেও টেলিফোনের অপর প্রান্তে আবদুল হাকিম চৌধুরী যে থামেন তা নয়। তিনি আবারও বলেন, ‘ও আমার একমাত্র সন্তান, জানেন তো ?’

‘জানি।’

‘আর একটা প্রশ্ন করি ?’

‘করুন।’

‘আমার এত টাকা, এত ব্যবসা, এত ইন্ডাস্ট্রি, এত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে, বলুন তো দেখি ?’

‘কে আবার, আপনার মেয়ে। নাজমা।’

‘এই তো ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক, একেবারে ঠিক বলেছেন।’ আবদুল হাকিম চৌধুরী হাসেন, হো-হো করে হাসেন। ‘এবার তাহলে শেষ প্রশ্নটাও করি, কী বলেন?’

‘বেশ তো, করুন।’

‘আপনার ছেলে আমার মেয়ের জামাই হলে কী হবে, বলুন তো দেখি?’

আবুল হাসান স্বভাবতই বলেন, ‘কী হবে, বলুন?’

‘আরে ধ্যাৎ, এ সহজ কথাটাও বুঝতে পারছেন না!’ আবদুল হাকিম চৌধুরী একই রকম হাসেন, হেসে বলেন, ‘আমার এত টাকা, এত ব্যবসার উত্তরাধিকারী শুধু আমার মেয়ে নয়, আপনার ছেলেও হবে, নাকি...’

কী বলতে চান আবদুল হাকিম চৌধুরী? ছেলেকে কিনতে চান? লোভ দেখাচ্ছেন? আবদুল হাকিম চৌধুরীর ইঙ্গিত বুঝতে পারেন, স্পষ্টতই বুঝতে পারেন। ভেতরটায় রিরি করে ওঠে, মাথায় বুঝি তাই এক চিলতে রক্তই উঠে যায় আবুল হাসানের। রাগে গরগর করতে থাকলেও নিজেকে কোনোমতে সংযত করেন তিনি। ‘আগে আমি আমার ছেলের মতামতটা জেনে নিই, কেমন? তারপর নাহয়...’

‘তারপর নাহয়’ পর্যন্ত বলে আবুল হাসানকে থেমে যেতে দেখেই আবদুল হাকিম চৌধুরী স্বভাবসুলভ হো-হো করে হাসেন, হেসে বলেন, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগে ছেলের মতামত নিন, তারপর নাহয় কথা হবে।’

‘তো রাখি, কেমন?’

‘ঠিক আছে, রাখুন।’

না, আজ আর অফিসে যেতে ভালো লাগে না, যানও না। একা একা বসে নিজেকে নিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে আর একমাত্র সন্তান শামীমকে নিয়ে ভাবেন। স্বভাবত দুটো প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। এক, শামীম বড় হয়েছে। তার বিয়ের বিষয়টা নিয়ে এবার ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। দ্বিতীয়ত যে প্রশ্নটা আজ সামনে এসে দাঁড়ায় তা এত ভয়াবহ যে ভাবতে গেলেই কেঁপে ওঠেন, শিউরে ওঠেন তিনি। একদিন না একদিন প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়াবে জানতেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি প্রশ্নটার মুখোমুখি হবেন ভাবেননি। সত্যি তো, আর কত দিন, কত কাল একটা সত্যকে আড়াল করে রাখবেন? সত্য যত নির্মমই হোক, নিষ্ঠুর হোক তা তো সত্যই। সত্যকে আর কত দিন, কত যুগ আড়াল করে রাখবেন তিনি?

শামীমের বিয়ের আগে ওকে সব বলবেন এটাই ভেবে রেখেছিলেন। আজ বিয়ের সময় হয়েছে তার, বিয়ে নিয়ে কথাবার্তাও হচ্ছে, কিন্তু কী করে বলবেন তিনি! কী করে! শামীম শুধু আজ আর সন্তানই নয়, তার পৃথিবীও। শামীমকে ঘিরেই তো তার আজকের স্বপ্ন দেখা, বেঁচে থাকা, সব। কী করে এত নিষ্ঠুর হবেন? কী করে বলবেন সব?

দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল হয়, কখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে বলতেও পারবেন না। ওঠা দরকার, ঘরের লাইট জ্বালানো দরকার। অন্ধকারে বসে থাকেন। ঘরে যে লাইট জ্বালানো দরকার তাও বুঝি ভুলে যান। বাড়িতে বাবার কালের বৃদ্ধ খানসামা করিমও এসে ক’বার উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু বিষণ্ন আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে যে লাইটের সুইচ অন করবে সে সাহস তার হয় না।

‘বাবা।’

কখন শামীম বাড়ি ফিরেছে, ঘরে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে বলতেও পারবেন না। শামীমের কণ্ঠে ‘বাবা’ ডাক শুনেই হুঁশ হয়।

‘কী হলো?’ শামীমই আবার বলে, ‘অন্ধকারে চুপচাপ বসে কী ভাবছ, বলো তো?’

‘কী আবার ভাবছি !’ আবুল হাসান মৃদু হাসার চেষ্টা করেন। ‘কই, কিছু ভাবছি না তো !’

‘দুপুর থেকেই নাকি একই রকম ঠায় বসে আছ !’ শামীম সুইচ অন করে ঘরের আলো জ্বালে। সমস্ত ঘর আলোর বন্যায় ভেসে ওঠে।

‘ও কিছু না। শরীরটা...’

কথা শেষ করতে দেয় না আবুল হাসানকে, শামীম বলে, ‘কী হয়েছে ? শরীর খারাপ ?’

‘না না, ও কিছু না।’

‘শুনলাম অফিসেও যাওনি ?’ শামীম বাবার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। ‘তুমি তো পারতপক্ষে কখনো অফিস মিস কর না। কী হয়েছে তোমার ?’

‘বলছি তো, কিছুই হয়নি।’

পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার আবুল হাসানের কাঁচাপাকা চুলে খানিক হাত বুলিয়ে দিয়ে শামীম আদুরে গলায় বলে, ‘বাবা।’

‘বলো।’

‘তোমার কী হয়েছে বলবে না আমাকে ?’

আবুল হাসান অস্ফুট বলেন, ‘হুঁ।’

‘তো বলো।’

‘নাজমাকে চিনিস তো ?’ আবুল হাসান প্রশ্ন করে ছেলের মুখের দিকে তাকান। ‘ওর বাবা আজ টেলিফোন করেছিলেন।’

‘নাজমা মানে, হাকিম চাচার মেয়ে ?’ শামীম চোখ বড় বড় করে বলে, ‘সেই নাজমা, যে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ইংরেজিতে কথা বলে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি নয়, ধুমধাড়াক্কা হিন্দি ইংরেজি গান শোনে, জীবনে একবার ভুলেও শাড়ি পরেনি ? তা কেন হঠাৎ হাকিম চাচা টেলিফোন করেছিলেন ?’

‘বিয়ে।’

‘বিয়ে ?’ শামীম হাসে। ‘কার বিয়ে ? নাজমার ?’

‘হুঁ, নাজমার।’

শামীম মেয়েটাকে একটুও পছন্দ করে না। ওর দু চোখের বিষই বলা যায় মেয়েটা। বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা ইংরেজি ভাবধারার হাইফাই নাজমার বিয়ের কথা শুনে সে তাই মজা পায়। ‘তা কবে বিয়ে ? কার সঙ্গেই বা বিয়ে, বলো বাবা ?’

শামীমের এ প্রশ্নের উত্তরে তখনই কিছু বলেন না আবুল হাসান। একটু থেমে তিনি বলেন, ‘কার সঙ্গে বিয়ে, শুনবে ?’

‘শুনব বাবা, শুনব।’ শামীম এবার আর নিঃশব্দে নয়, একটু হলেও শব্দ করে হাসে। ‘যার সঙ্গে ওর বিয়ে সে বাঙালি, না ইংরেজ ? ইংরেজ হলে আমার আপত্তি নেই। বাঙালি হলে আপত্তি আছে।’

ছেলের কথা আবুল হাসান শুনতে পান না তা নয়, পান। বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে একটু হলেও তাই হাসেন তিনি। ‘যদি বলি বিয়েটা আর কারো সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে, তো ?’

‘কী বললে ! কী বললে তুমি !’ এতটা চমকে ওঠে শামীম যে হঠাৎ যেন ভূত দেখেছে। ‘ইয়ে মানে, কী বললে বাবা ! কার সঙ্গে বিয়ে !’

ছেলের অবস্থা দেখে আবুল হাসান চৌধুরী বেশ মজা পান। তিনি তাই মুচকি হাসেন। ‘কার সঙ্গে আবার, তোমার সঙ্গে।’

‘আরে বাপরে, কী বলছ তুমি !’ ভয়ে, উৎকণ্ঠায় শামীম দুটো চোখ বড় বড় করে তাকায়। ‘বিয়ে আমার সঙ্গে মানে !’

‘আমি বাংলায় বলেছি, তুমি বুঝতেও পেরেছ।’ আবুল হাসান ছেলেকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে হাসেন। ‘তোমার সঙ্গে বিয়ে মানে, তোমার সঙ্গে বিয়ে, তোমার হাকিম চাচা...’

আবুল হাসানকে কথা শেষ করতে দেয় না, মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে বিরক্তি-স্বরে শামীম বলে, ‘আমার মতামত নেয়ারও তুমি প্রয়োজন মনে করলে না বাবা ?’

ছেলের এ প্রশ্নের উত্তরে আবুল হাসান কেন যেন এবার আর কিছু বলেন না। কেবল মুচকি হাসেন।

শামীমই আবার বলে, ‘বাবা।’

‘বলো।’

‘আমার একটা কথা তুমি শুনবে বাবা ?’

আবুল হাসান হাসেন, মুচকি হাসেন। ‘বলো, শুনছি।’

‘ওকে আমার...’

‘ওকে আমার’ পর্যন্ত বলে আর বলতে পারে না শামীম, থেমে যায়। শামীমকে কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখে আবুল হাসান হেসে ছেলের মুখের দিকে তাকান। ‘কী হলো, থেমে গেলে কেন ? ওকে তোমার কী, বলো ?’

‘নাজমাকে আমার ভালো লাগে না। একদম ভালো লাগে না বাবা, বিশ্বাস করো।’

‘জানি।’

‘জানো ?’ বাবার মুখে ‘জানি’ শুনেই চমকে তাকায় শামীম। ‘তুমি জানো মেয়েটাকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না ?’

আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, ‘হুঁ, জানি।’

‘জেনেশুনে, বুঝে তো কী করে ওর সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা বললে তুমি ?’ শামীম অসহায়ের মতো একবার বাবার মুখের দিকে, একবার এদিক-ওদিক তাকায়। ‘এ তুমি কী করলে বাবা ? আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না তুমি ?’

‘এ আমি কী করেছি, না ?’

‘হ্যাঁ, এ তুমি কী করলে বাবা ?’

‘শুনবে ?’

‘শুনতেই তো চাই।’

‘তোমার হাকিম চাচা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন এটা ঠিক। কিন্তু প্রস্তাব দেয়া মানে কি বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া বলো ?’ আবুল হাসান হাসিমুখে ছেলের মুখের দিকে তাকান। ‘আরে তোমার মতামত নেব না, এটা কী করে

ভাবলে তুমি !'

'মতামত নেবে ?'

'নিশ্চয়ই নেব।' আবুল হাসান গভীর মমতায় ছেলের মুখের দিকে তাকান। 'তোমার জীবনের অন্যতম একটা সিদ্ধান্ত, আর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব না, তোমার মতামতটা পর্যন্ত নেব না, এটা ভাবলে কী করে তুমি !'

শামীম এক মুহূর্ত দেরি করে না, সে আবারও বলে, 'আমার ওকে পছন্দ নয় বাবা, একটুও পছন্দ নয়।'

আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, 'আমারও।'

শামীমের যেন খুশির সীমা থাকে না। 'আমাকে বাঁচালে বাবা। আমি তো...'

শামীমকে কথা শেষ করতে দেন না, আবুল হাসান বলেন, 'ভেবেছিলে তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই আমি মতামত দিয়ে ফেলেছি, না ?'

শামীম এবার হাসে, কিছু বলে না।

'কিন্তু তোমার সম্পর্কেও এবার আমাকে ভাবতে হবে যে বাবা।' আবুল হাসান বলেন।

আবুল হাসানের কথা বোঝার কথা নয়, বুঝতে পারেও না শামীম। সে তাই এবারও কিছু বলে না। অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকায়।

'বিয়ে।'

আবুল হাসানের মুখে 'বিয়ে'র কথা শুনে বুকের ভেতরটায় ধক করে ওঠে শামীমের। 'বিয়ে ! কার বিয়ে বাবা !'

'তোমার।'

'আমার ! আমার বিয়ে !'

'হুঁ, তোমার বিয়ে।'

আবারও বুকের ভেতরটায় ধক করে ওঠে। 'ইয়ে মানে, বলছিলাম কি বাবা, আমার আবার হঠাৎ বিয়ে কেন, বলো তো ?'

'কেন ?'

'হ্যাঁ, আমার আবার হঠাৎ বিয়ে কেন ?'

'কারণ, তোমার এখনো একটা বিয়ে হয়নি যে তাই।' আবুল হাসান এবার আর নিঃশব্দে নয়, শব্দ করেই হাসেন। 'কী, হয়েছে তোমার বিয়ে, বলো ?'

এ কথার জবাবে কিছুই বলে না, ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো আবুল হাসানের দিকে কেবল চেয়ে থাকে শামীম।

'শামীম।'

'বলো বাবা।'

'তুমি বড় হয়েছ, তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে, ঠিক কি না বলো ?'

এখন কী বলবে সে ? ঠিকই তো, বিয়ে করার মতো বয়স তো তার ঠিকই হয়েছে। আবুল হাসানের প্রশ্নের

উত্তরে তাই এবারও চুপ করে থাকে, কিছুই বলে না।

'আমি তোমার জন্যে মনে মনে একজনকে ঠিক করেছি বাবা।'

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও শামীম এতটা হতবাক হতো না। 'বলছিলাম কি বাবা...'

'মেয়েটা ভালো।'

'ইয়ে মানে, বলছিলাম কি বাবা...'

এবারও মুখের কথা শেষ করতে দেন না শামীমকে, আবুল হাসান বলেন, 'ভালো মানে, খুব ভালো মেয়ে ও, জানো?'

'কিন্তু আমি তো...'

'কিন্তু আমি তো' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারে না শামীম, থেমে যায়।

শামীমকে কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখে আবুল হাসান মুচকি হেসে ছেলের মুখের দিকে তাকান। 'দেখতে শুনতে কেমন, জানতে চাইলে না?'

কী বলবে না বলবে কিছুই ভেবে না পেয়ে শামীম অস্ফুট স্বরে বলে, 'বাবা।'

'সুন্দরী, বুঝলে খুব সুন্দরী।' আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, 'যাকে বলে পরী, বুঝেছ? ডানাকাটা পরী।'

'কিন্তু আমি তো একজনকে...'

'ভালোবাসি' কথাটা বলতে চায়, কিন্তু পারে না শামীম।

আবুল হাসানই আবার বলেন, 'আমার এত ভালো লেগেছে যে, কী বলব তোমাকে! আমি তো মনে মনে ঠিক করেছি, ওকেই পুত্রবধূ করব, বুঝেছ?'

শামীম দিশেহারার মতো তাকায়।

'ওর নাম শুনতে চাইলে না?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শামীম বলে, 'কী নাম, বলো?'

আবুল হাসান হাসেন, হেসে বলেন, 'অনন্যা।'

'কী বললে! কী বললে তুমি বাবা!' নাহ্, আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও শামীম এতটা খুশি হতো না। অপরিসীম খুশিতে যেন দোল দোল নাগরদোলার মতো দুলে ওঠে সে। 'অনন্যা! অনন্যাকেই তুমি পছন্দ করেছ বাবা!'

আবুল হাসান হাসেন, মুচকি হেসে বলেন, 'হুঁ, করেছি।'

৭

'অনন্যা।'

অনন্যা বলে, 'বলুন।'

জয়দেবপুর ন্যাশনাল পার্ক ছাড়িয়েও দূরে এক গ্রামের ধান ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে শামীম বলে, 'আজ আমি আপনাকে কিন্তু একটা কথা বলব অনন্যা।'

‘একটা কেন, দরকার হলে একশটা বলুন।’ প্রকৃতির কাছাকাছি এলে অনন্যার এমনিতেই ভালো লাগে। সে তাই হাসে। ‘মানা করেছে কে আপনাকে, বলুন তো ?’

‘তার আগে একটা কথা আছে যে।’

শামীমের কথা বোঝার কথা নয়, অনন্যা তাই অবাক হয়ে তাকায়। ‘কী রকম, বলুন ?’

শামীম হাসে, হেসে বলে, ‘ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে ?’

অনন্যাও হাসে। ‘নির্ভয়ে বলুন।’

‘রেগে যাবেন না তো ?’

‘না।’

‘বলছিলাম কি, আমরা একে অপরকে আপনি সম্বোধন না করে, তুমি বলতে পারি না ?’

‘ধ্যাৎ, এ কথাটা বলতে এত গাঁইগুঁই করছেন ?’ দমকা হাওয়ার দোলায় যেন দুলে ওঠে অনন্যা, মনের আনন্দে খানিক খিলখিল করে হেসে সে বলে, ‘বাপরে বাপ, এই কথাটা বলার জন্যে এত ভূমিকা আপনার !’

‘অনন্যা।’

‘বলুন।’

‘আপনি রাগ করেননি তো ?’

অনন্যা একই রকম হাসে। ‘না, একটুও না।’

‘তাহলে আপনি রাজি ?’

অনন্যা বলে, ‘হুঁ।’

‘তো আমরা একে অপরকে আজ থেকে, মানে এখন থেকেই তুমি বলতে পারি ?’

‘না।’

‘কী, বলছেন কী !’ রাজি হয়েও আবার না বলছে কেন, স্বভাবত অবাক হয়ে যায় শামীম। ‘আপনি রাজি না, বলুন তো ?’

অনন্যা বলে, ‘রাজি।’

‘তাহলে না বলছেন কেন, বলুন ?’

‘আজ না। আজ থাক।’ অনন্যা মাথা নিচু করে বলে, ‘আজ পারব না।’

‘কেন ? কেন পারবেন না ?’

‘হঠাৎ করে...’

‘অনন্যা।’

‘বলুন।’

‘বলুন নয়, বলো হবে অনন্যা।’

শামীমের এ কথার উত্তরে অনন্যা মাথা নিচু করে হাঁটে। কিছু বলে না।

‘আমি কিন্তু আজই তোমাকে তুমি বলব অনন্যা।’

‘কেন ? হঠাৎ আজই কেন তুমি বলতে হবে ?’

‘শুনবে ?’

‘শুনতেই তো চাই।’

‘আমার তোমাকে...’

‘আমার তোমাকে’ পর্যন্ত বলে আর বলতে পারে না, থেমে যায় শামীম।

‘কী হলো, থেমে গেলেন কেন ?’ অনন্যা এক পলক হলেও মাথা তুলে শামীমের দিকে তাকায়। ‘আমাকে আপনার কী, বলুন ?’

‘তোমাকে আমার ভালো লাগে অনন্যা।’

‘জানি।’

শামীম অবাক হয়ে তাকায়। ‘তুমি জানো, তোমাকে আমার ভালো লাগে !’

‘হুঁ, জানি।’

‘তোমাকে আমার...’

এবারও বলতে পারে না শামীম। রাজ্যের লজ্জা এসে ভিড় করে তার চোখেমুখে।

‘কী, হলো কী আপনার ?’ অনন্যা এবার শামীমের চোখে চোখ রেখে তাকায়। ‘আবারও থেমে গেলেন কেন আপনি, বলুন তো ?’

‘ইয়ে মানে, বলছিলাম কি...’

শামীমের কাণ্ডকারখানা দেখে অনন্যা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, একটু হলেও খেপে যায়। খেপে গিয়ে বলে, ‘শুনুন।’

‘বলো অনন্যা।’

‘একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো ?’

‘না, তুমি বলো।’

‘একটা কথা বলবেন, কিন্তু তার জন্যে এত আমতা আমতা করছেন কেন আপনি, বলুন তো ?’

‘ইয়ে মানে, বলছিলাম কি অনন্যা...’

কথা শেষ করতে দেয় না শামীমকে, অনন্যা কথা কেড়ে নিয়ে বলে, ‘আবারও সেই ইয়ে মানে ইয়ে মানে করছেন !’

‘আমি আসলে একটু...’

‘নার্ভাস হয়ে গেছেন, না ?’

শামীম এবার আর কিছু বলে না, কেবল বোকার মতো মাথা ঝাঁকায়।

‘আপনি কি একটা কথা জানেন ?’

‘কী ?’

‘মেয়েরা পছন্দ করে কোন ধরনের পুরুষকে, জানেন ?’

‘কোন ধরনের ?’

‘আর যাকেই পছন্দ করুক, আপনার মতো মিনমিন করা পুরুষমানুষকে নিশ্চয়ই পছন্দ করে না, বুঝেছেন ?’ অনন্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শামীমের দিকে তাকায়। ‘আমার এখন কেমন লাগছে, বলব ?’

শামীম দেরি করে না, বলে, ‘বলো।’

‘আপনার হালহকিকত দেখে, আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, বুঝেছেন ?’

এ প্রশ্নের জবাবেও শামীম বোকার মতো মাথা ঝাঁকায়।’

‘মেয়েরা কাদের ভালোবাসে, পছন্দ করে, জানেন ?’

‘বলো।’

‘বীরকে, বুঝেছেন, বীরকে।’ অনন্যা আবারও শামীমের চোখে চোখ রেখে তাকায়। ‘মেয়েরা আর যাকেই পছন্দ করুক, এটা কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, আপনার মতো কাপুরুষকে, কখনোই এমন মিনমিনে কাপুরুষকে পছন্দ করে না।’

‘আমি কাপুরুষ !’ এই প্রথম একটু হলেও ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শামীম। ‘এ কথা তুমি বলতে পারলে অনন্যা !’

‘কাপুরুষ না তো কী ?’ অনন্যা হাঁটতে হাঁটতে বলে, ‘মেয়েছেলের মতো তখন থেকে যেভাবে লজ্জায় লাল হয়ে আছেন, অনবরত মিনমিন করছেন, আপনাকে কাপুরুষ না তো কী বলব ? বীর, বীর বাহাদুর ?’

অনন্যার এ কথার জবাবে শামীম আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে দুজনে কেবল হাঁটে।

‘একটা কথা বলি ?’ অনন্যাই আবার বলে।

শামীম হাঁটতে হাঁটতে বলে, ‘হুঁ, বলো।’

‘আচ্ছা, আপনি এমন কেন, বলুন তো ?’

শামীম হাঁটতে হাঁটতেও তাকায়। ‘কেমন, বলো ?’

‘আপনি কেমন, বলব ?’ অনন্যা হাসে, মুচকি হেসে বলে, ‘মেয়েছেলে মার্কা পুরুষ। যাকে বলে, যাচ্ছেতাই রকমের একটা মেয়েছেলে মার্কা পুরুষ।’

‘তাই ?’

‘হ্যাঁ, তাই।’

‘এবার তাহলে পুরুষের মতো একটা কথা বলি, কেমন ?’ শামীম দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ‘কী, বলব কথাটা ?’

‘বলুন।’

‘ইয়ে মানে...’

‘ইয়ে মানে’ পর্যন্ত বলে এবারও কিন্তু আর বলতে পারে না, থেমে যায় শামীম।

শামীমকে সেই একই রকম কথার মধ্যে থেমে যেতে দেখে, মিনমিন করতে দেখে অনন্যা কিন্তু এবার আর রাগ করে কিছু বলে না, বরং হাসে। খানিক খিলখিল করে হাসে।

অনন্যাকে হাসতে দেখে শামীম অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। 'তুমি হাসছ অনন্যা !'

অনন্যা একই রকম জলতরঙ্গের শব্দে হাসে। 'হুঁ, হাসছি।'

'কিন্তু কেন হাসছ ?' শামীম বুঝি ভেতরে ভেতরে একটু হলেও রেগেই যায়।

'বুঝতে পারছেন না ?'

শামীম দেরি করে না, বলে, 'না।'

পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। অনন্যা ঘাড় ফিরিয়ে শামীমকে একবার দেখে। 'আপনি আসলে সত্যি কিছু বলবেন ?'

'বলব তো।'

'তো বলছেন না কেন ?' অনন্যা আবারও হাসে। 'সত্যি, আপনি না...'

'আর কী বলবে ? এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে অনেক তো বললে অনন্যা।' শামীমের মুখচোখ সব গম্ভীর, থমথমে। 'আমি মিনমিনে, আমি কাপুরুষ, আমি যাচ্ছেতাই রকমের মেয়েছেলে মার্কা পুরুষ, সবই তো বললে। আছে নাকি আরো কিছু বলার ? আছে, বলো ?'

'আছে।'

'তো বলো, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

'আপনি একটা ভীতু, ভীতুর আণ্ডা, বুঝেছেন ?'

শামীম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'হবে হয়তো, আমি হয়তো ভীতুর আণ্ডাই।'

'হবে হয়তো নয়।' অনন্যা হাসে, প্রাণখুলে হাসে। 'আপনি ভীতুর ডিমই, আন্ডাই।'

'ছোটবেলা থেকেই আমার কোনো মেয়েবন্ধু নেই, জানো ?'

'আগে জানতাম না। এখন জানলাম।'

'তাই কী করে যে কথাটা বলতে হয় আমি জানি না।'

'কী কথা ?'

'মনের কথা।'

'মনের কী কথা, বলুন ?'

'ইয়ে মানে...'

আবারও বলতে পারে না। আবারও কথার মধ্যে থেমে যায় শামীম। ব্যস, আবারও সেই একই রকম খিলখিল করে হাসে অনন্যা।

'আমি বলি কি, আজ নাহয় থাক। আজ নাহয় বলব না।'

'কেন ?'

‘অন্য একদিন নাহয় বলব।’

‘না, আজই বলুন।’ শামীমের অবস্থা দেখে অনন্যা একই রকম হাসে। ‘আমি শুনব, আপনি বলুন।’

‘আজ থাক।’ বলবে কি, শামীম লজ্জায় লাল হয়ে, আড়ষ্ট হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। ‘আমি আজ বলতে পারব না।’

‘এবার আমি বলি ?’

‘বলো।’

‘আপনি কী বলতে চান আমি জানি।’

‘তুমি জানো !’

‘হুঁ, জানি।’

‘তুমি সত্যি জানো !’ অবাক হয়ে তাকায় শামীম। ‘কী করে জানো তুমি !’

‘কী করে জানি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।’ অনন্যা হাসে। ‘আমি জানি এটাই গুরুত্বপূর্ণ, বুঝেছেন ?’

শামীম অবাক হয়ে বলে, ‘কী জানো, বলো।’

‘আপনি আমাকে ভালোবাসেন, এই তো ?’

‘হুঁ, ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি। এত ভালোবাসি যে...’

শামীমকে থেমে যেতে দেখেই অনন্যা তাকায়। ‘কী হলো, থেমে গেলেন যে, বলুন।’

‘হ্যাঁ, ভালোবাসি অনন্যা। তোমাকে ভালোবাসি আমি।’ কোথা থেকে যে এত সাহস পায় শামীম, নিজেও ভেবে পায় না। ‘আমি আমার নিজের জীবনের চেয়েও তোমাকে...’

‘বেশি ভালোবাসেন ?’ অনন্যা বলে, ‘নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন ?’

‘হ্যাঁ অনন্যা, হ্যাঁ। বিশ্বাস করো তুমি।’ অনন্যার দিকে নয়, গভীর দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঁচকে দূরে, বহু দূরে তাকায় শামীম। ‘তোমাকে না পেলে...’

শামীমকে এবারও আগের মতো কথা শেষ করতে দেয় না। থামিয়ে দিয়ে অনন্যা বলে, ‘আমাকে না পেলে মরে যাবেন, এই তো ?’

‘হ্যাঁ অনন্যা, হ্যাঁ। বাঁচব না।’ শামীম অনেকক্ষণ পর এই প্রথম স্থির চোখে অনন্যার দিকে তাকায়। ‘তোমাকে না পেলে আমি সত্যি বাঁচব না অনন্যা। বিশ্বাস করো তুমি।’

‘আমি বিশ্বাস করি না।’

‘মিথ্যে নয়, আমি সত্যি বলছি অনন্যা।’ শামীম দিশেহারার ভঙ্গিতে তাকায়। ‘বিশ্বাস করো অনন্যা, বিশ্বাস করো তুমি।’

‘আপনি জানেন না, আমার মা হচ্ছে আমার সব।’ অনন্যা আনমনা বলে, ‘সেই মা আমাকে বড় হওয়ার পর থেকে কী শিখিয়েছে, জানেন ?’

শামীম বলে, ‘কী ?’

‘পুরুষরা মিথ্যে কথা বলে, পুরুষদের কখনো বিশ্বাস করবি না মা। ওদের মিথ্যে কথায় কখনো ভুলবি না

তুই।'

শামীম উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকায়। 'কিন্তু আমি তো...'

'মিথ্যে বলছেন না, এই তো ?'

'হ্যাঁ, বলছি না।' শামীম দিশেহারার মতো বলে, 'বিশ্বাস করো তুমি, একটুও মিথ্যে বলছি না।'

'কী করে বিশ্বাস করি, বলুন ?' অনন্যা শামীমের দিকে আর তাকায়ও না। 'ছোটবেলা থেকে এই এক মাকেই দেখেছি। মা যা শিখিয়েছেন, বলেছেন, তা-ই বিশ্বাস করেছি।'

'এবার আমি একটা প্রশ্ন করি তোমাকে অনন্যা ?'

'বলুন ?'

'সত্যি বলবে তো, বলো ?'

'আমার মা আমাকে মিথ্যে বলা শেখাননি।'

'তোমার আমাকে কেমন লাগে ?'

এই প্রশ্নের উত্তরে অনন্যা কেন যেন এবার আর কিছু বলে না। চুপ করে থাকে।

'কই, বললে না, তোমার আমাকে কেমন লাগে ?' শামীম উদ্‌ভ্রান্তের মতো, দিশেহারার মতো বলে, 'খারাপ, না ?'

এবার আর দেরি করে না অনন্যা, বলে, 'না।'

'ভালো লাগে ?' শামীম বলে, 'বলো, ভালো লাগে ?'

শামীমের বেপরোয়া দৃষ্টির সামনে, এমন অপরিসীম ভালোবাসার সামনে দাঁড়িয়ে অনন্যার যে কী হয় নিজেও বুঝতে পারে না। কোনোমতে অস্ফুট বলে সে, 'হুঁ, লাগে। ভালো লাগে।'

ব্যস, খুশি ! অফুরন্ত খুশি এসে যেন আছড়ে পড়ে শামীমের প্রতি ফোঁটা রক্তের গভীরে। 'অনন্যা, এই অনন্যা।' গভীর আবেগে অনন্যার পুতুলের মতো সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে শামীম বলে।

'বলুন।'

'বলুন নয় অনন্যা। বলো হবে, বলো।'

অনন্যারও ভেতরে ভালো লাগার কী তোলপাড় ঝড় ওঠে কে জানে ! সে একটুও দেরি করে না, বলে, 'হুঁ, বলো।'

৮

গাড়ি ছুটে চলে আশি, নব্বই, একশ কিলোমিটার বেগে কক্সবাজার ছাড়িয়ে, মরিচা ছাড়িয়ে, উখিয়াও ছাড়িয়ে বালুখালীর দিকে। অজগরের মতো এঁকেবেঁকে যাওয়া পিচঢালা রাস্তা। দু পাশে ছোট-বড় উঁচু-নিচু পাহাড় আর অরণ্য। যেদিকে দু চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ।

এঁকেবেঁকে চলা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আবুল হাসান অনন্যার দিকে তাকান, তাকিয়ে বলেন, 'অনন্যা।'

অনন্যা বলে, 'বলুন।'

‘একটা প্রশ্ন করব মা তোমাকে ?’

‘বেশ তো, করুন।’

‘আমি ঢাকা থেকে কেন এত দূর ছুটে এসেছি, তোমার মার কাছে যাচ্ছি, তুমি জানো ?’

‘হুঁ, জানি।’

‘কেন যাচ্ছি, বলো ?’

‘বলব ?’

‘হ্যাঁ, বলো।’

‘আপনি আপনার স্বপ্নের জন্যে যাচ্ছেন।’ অনন্যা বলে, ‘আপনি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে যাচ্ছেন।’

‘স্বপ্ন ?’

‘হ্যাঁ, স্বপ্ন।’

‘কী স্বপ্ন, বলো তো ?’

এ প্রশ্নের উত্তরে তখনই যে বলে অনন্যা তা নয়। একটু থামে। থেমে ভেতরে ভেতরে এরপর কী বলবে তা বুঝি গুছিয়ে নেয় সে। তারপর বলে, ‘আপনি আমার মার কাছে আমাকে চাইতে যাচ্ছেন।’

‘কী করে বুঝলে !’ কোথা থেকে যে এত খুশি এসে ঠিকরে পড়ে চোখেমুখে নিজেও বুঝতে পারেন না আবুল হাসান। ‘কী করে এত ঠিক ঠিক তুমি বললে মা !’

‘পারব না কেন, বলুন ?’ অনন্যাও হাসে, হেসে বলে, ‘আমি আপনার মেয়ে না হলেও মেয়ের জায়গা জবরদখল করে আছি যে !’

‘জবরদখল নয় মা।’ আবুল হাসান হাসেন, হো-হো করে হাসেন। ‘বাপের হৃদয়ে মেয়ের কি জায়গা দখল করতে হয় ? বাপের হৃদয়ে তো মেয়ের জন্যে একটু-আধটু নয়, পুরো জায়গা থাকে। তবে...’

‘তবে’ পর্যন্ত বলেই থেমে যান আবুল হাসান, আর বলেন না।

আবুল হাসানকে থেমে যেতে দেখেই অনন্যা বলে, ‘কী হলো, থেমে গেলেন যে ? তবে কী, বলুন ?’

‘তবে তুমি যদি সত্যি আমার মেয়ে হতে তাহলে এ পৃথিবীতে আমার চে সুখী আর কেউ থাকত না, জানো ?’ আবুল হাসান অপরিসীম মমতায় পাশে বসা অনন্যার দিকে গভীর দু চোখে তাকান। ‘বিশ্বাস করো অনন্যা, বিশ্বাস করো তুমি, আমার চে সুখী আর কেউ থাকত না।’

‘একটা কথা বলব ?’ মনপ্রাণ সব কানায় কানায় ভরে যায় অনন্যার। ‘বলব নাকি কথাটা, বলুন ?’

‘বলো।’

‘আপনি আমাকে এত ভালোবাসেন কেন ?’ অনন্যা চলন্ত গাড়িতে পাশে বসা আবুল হাসানের দিকে তাকায়। ‘কেন ভালোবাসেন এত, বলুন তো ?’

কথা বুঝি পুরোপুরি শেষও হয় না অনন্যার, আবুল হাসান মনের খুশিতে হো-হো করে হেসে বলেন, ‘এত বোকা তুমি মা ! এত বোকা !’

‘আমি বোকা !’ আবুল হাসানের কথা বুঝতে পারে না অনন্যা। সে তাই অবাক হয়ে আবুল হাসানের মুখের দিকে তাকায়। ‘কী বলছেন !’

‘হ্যাঁ, বোকাই তো।’ আবুল হাসান একই রকম মনের খুশিতে প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেন, ‘বোকা না তো কী ! আরে, এক বাবাকেই কিনা জিজ্ঞেস করছ সে তার মেয়েকে এত ভালোবাসে কেন ?’

আবুল হাসানের কথা ভালো লাগে, বড় ভালো লাগে অনন্যার। ‘আচ্ছা, আপনি তো যাচ্ছেন, কিন্তু...’

‘কিন্তু কী মা, বলো ?’

আবুল হাসানের সঙ্গে রওনা দেয়ার পর থেকেই দুরু দুরু বক্ষে যে কথাটা ভাবছিল অনন্যা, এবার সে কথাটাই বলে সে, ‘আচ্ছা, মা যদি রাজি না হন, তো ?’

‘কেন রাজি হবেন না, বলো ?’ কথাটা আবুল হাসানও ভাবেনি তা নয়, তিনি তবু বলেন, ‘ছেলে হিসেবে শামীম তো ফেলনা নয়, ভালো, বেশ ভালো। তাহলে কেন উনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন ? কেন রাজি হবেন না, বলো ?’

আবুল হাসানের এ কথার উত্তরে কিছু বলার আগেই আবুল হাসানের লেটেস্ট মডেলের বিশাল পাজেরো গাড়ি বালুখালী এসে পৌঁছায়। অনন্যা ড্রাইভারকে স্কুল এবং স্কুলের পাশেই তাদের বাংলোবাড়ি দেখিয়ে দেয়। গাড়ি বাংলোর সামনে এসে থামতেই দুজনে একে একে গাড়ি থেকে নামে।

তখন চারদিকে রোদ। বিকেলের সোনারোদ। অনন্যা আবুল হাসানকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়েই ভেতরে ছুটে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসে। ‘মা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আসছেন। তবে...’

‘তবে’ পর্যন্ত বলেই অনন্যাকে থেমে যেতে দেখে আবুল হাসান বলেন, ‘তবে পর্যন্ত বলে থেমে গেলে কেন মা ? কী বলবে, বলো।’

‘তবে মা আপনার সামনে আসতে চাইছেন না।’

‘কেন !’ আবুল হাসান অবাক হয়ে তাকান। ‘কেন আসতে চাইছেন না !’

অনন্যা মিষ্টি হাসে। ‘আমি চিঠিতে আপনার সম্পর্কে সব লিখেছি যে।’

‘কী লিখেছ তুমি !’

‘আমি আপনাকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করি, জানি, এটা লিখেছি।’ অনন্যা হাসে, হেসে বলে, ‘মা তাই আপনার সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছেন, খুব লজ্জা পাচ্ছেন।’

‘অনন্যা।’ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে অনন্যার মা সুপ্তি বলেন, ‘তুমি একটু ভেতরে যাও তো মা। ওনার জন্যে আমি নাশতা তৈরি করেছি। নিয়ে এসো, যাও।’

অনন্যা দেরি করে না। চলে যায়।

সুপ্তি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘অনন্যা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।’

আবুল হাসান দেরি করেন না, বলেন, ‘অনন্যা ভালো মেয়ে। এত ভালো মেয়ে যে বলেও শেষ করা যায় না।’

‘অনন্যাই আমার সব।’ সুপ্তি দরজার ওপাশ থেকে বলেন, ‘ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।’

‘জানি।’

দুজনের কথার মধ্যে এ সময় অনন্যা একটা মাঝারি সাইজের ট্রেতে সাজিয়ে ঘরে বানানো নানা রকমারি পিঠা এবং পায়েস নিয়ে ঢোকে। ‘এত কিছু !’ এত নাশতা দেখেই আবুল হাসান চোখ বড় বড় করে তাকান। ‘আরে, আমি রাক্ষস নাকি ! এত কী করে খাব, বলো তো ?’

‘খান তো !’ অনন্যা হাসে, মিষ্টি হাসে। ‘আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, আমি কত খুশি হয়েছি !’

‘অনন্যা, তুমি ভেতরে যাও।’ আবুল হাসান ও অনন্যার কথার মধ্যে সুপ্তি বলেন।

মার কথা শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকে না অনন্যা। ভেতরে চলে যায়।

‘আমি আপনার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছিলাম।’

‘বলুন।’ সুপ্তি দেরি করে না, বলে, ‘কী কথা, বলুন ?’

‘কথাটা রাখবেন কি না, প্রথমে বলুন ?’

‘আগে বলুন, শুনি, তারপর তো রাখা না-রাখার কথা।’

‘এটা আপনার কাছে আমার আর্জিও বলতে পারেন, ভিক্ষেও বলতে পারেন।’ আবুল হাসানের কণ্ঠ থেকে অন্তহীন মিনতি ঝরে পড়ে। ‘হ্যাঁ, ধরে নিন আপনার কাছে আমি আজ ভিক্ষে চাইতেই এসেছি, ভিক্ষেই চাইছি।’

‘এসব কী বলছেন আপনি !’ সুপ্তি আবুল হাসানের কথা কিছুই বুঝতে পারেন না। ‘ভিক্ষে মানে ! আপনার এত আছে। আপনি কেন ভিক্ষে চাইবেন !’

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার সব আছে, সব। অর্থ, সম্পদ সব। কিন্তু একটা জিনিস নেই।’ আবুল হাসান একটা পাটিসাপটা পিঠা ভেঙে মুখে দিয়ে বলেন, ‘সেটা কী, বলব ?’

‘কী ?’

‘একটা মেয়ে।’ আবুল হাসান মনের খুশিতে খান, খেতে খেতেও বলেন, ‘অনন্যার মতো একটা মিষ্টি মেয়ে। যা আপনার আছে, কিন্তু আমার নেই।’

আবুল হাসানের এ কথার পর সুপ্তি খানিকক্ষণ কিছু বলেন না। আবুল হাসানই আবার বলেন, ‘আপনার সেই মেয়েটাকে আমি চাই। চাই মানে, চাই-ই চাই, বুঝেছেন ?’

‘মানে !’

‘ওকে আমি আমার মেধাবী, বিনয়ী, শান্ত, সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছেলের বউ করে ঘরে তুলে নিতে চাই।’ আবুল হাসান একটা পিঠা খাওয়া শেষ করে আরেকটা নেন। ‘অবশ্য আপনি আমার এ আর্জি যদি মঞ্জুর করেন তো।’

আবুল হাসান কথা শুরু করার পরই কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন চেনা লেগেছে। ব্যস, এবার চেনা, বড় চেনা, অতি প্রিয় একজনের, তার জীবনের স্বপ্নের একজনের, ভালোবাসার একজনের, সুখ-দুঃখের একজনের কণ্ঠের সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পান। আর দেরি করেন না। পুরাতন বাংলোবাড়ির বাঁশের কঞ্চির ভেতর দিয়ে একটু দেখেই কেঁপে ওঠেন, ভয়ানক কেঁপে ওঠেন সুপ্তি। চোখের সামনের পৃথিবীটাই যেন নিমিষে দুলে ওঠে তার। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। ছুটে যান। শোবার ঘরের বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন।

মাকে হঠাৎ বেড়ার ফাঁক দিয়ে আবুল হাসানকে একটু দেখে ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদতে দেখে অনন্যা কিছুই বুঝতে পারে না। ঘটনার আকস্মিকতায় কোনো কিছু না ভেবেই সে এবার বৈঠকখানা ঘরে আবুল হাসানের কাছে ছুটে আসে। ছুটে এসে বলে, ‘আচ্ছা, একটা কথা বলব ?’

‘বলো।’

‘মা কি আপনাকে চেনেন ?’

অনন্যার কথায় আবুল হাসান অবাক না হয়ে পারেন না। ‘তোমার মা আমাকে চেনেন কি না হঠাৎ এ কথা

জিজ্ঞেস করছ কেন মা, বলো তো!'

'দূর থেকে দেখলাম বেড়ার ফাঁক দিয়ে মা আপনাকে দেখেই শোবার ঘরের দিকে উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাই বলছিলাম...'

কথা শেষও করতে দেন না অনন্যাকে। থামিয়ে দেন আবুল হাসান। 'তোমার মার কী নাম, বলো তো ?'

অনন্যা দেরি করে না, বলে, 'ডাকনাম সুপ্তি। পোশাকি নাম, অলকা হাসান।'

'কী বললে ! কী বললে তুমি !' মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও বুঝি এতটা অবাক হতেন না আবুল হাসান। সুপ্তি ! তার সুপ্তি ! তার ভালোবাসার সুপ্তি ! তার হারিয়ে যাওয়া সুপ্তি ! 'তোমার কাছে তোমার মার কোনো ছবি আছে অনন্যা, বলো না।'

'হুঁ, আছে।'

'তো দেবে একটা ছবি ?'

অনন্যা আর দেরি করে না। একটা ছবি অ্যালবাম এনে আবুল হাসানের হাতে তুলে দেয়।

ছবি দেখে আর এক মুহূর্ত দেরি করেন না। পড়ি কি মরি করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সুপ্তির কাছে ছুটে যান আবুল হাসান। সুপ্তি তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

ঘরে ঢুকেই আবুল হাসান বলেন, 'সুপ্তি !'

সুপ্তি কিছু বলেন না, তাকানও না। কেবল কাঁদেন।

'আমি তোমার শুভ্র, সুপ্তি। তোমার শুভ্র এসেছি, দেখো ?'

হাউমাউ করে আবারও কেঁদে ওঠেন সুপ্তি। 'নিজের মেয়েকেই আজ আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছ তুমি, না ?'

'আমার মেয়ে !' হতবাক হয়ে যান আবুল হাসান। 'অনন্যা আমার মেয়ে !'

আবারও কাঁদেন সুপ্তি, ডুকরে কেঁদে বলেন, 'তোমার কাছ থেকে আসার সময় সেদিন আর কিছু নয়, তোমার দেয়া এ শ্রেষ্ঠ উপহারটা নিয়ে এসেছিলাম গো।'

'সত্যি বলছ সুপ্তি ! সত্যি !' খুশি ! প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে যেন হাজারো খুশি ছড়িয়ে যায় আবুল হাসানের। না, আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও এত খুশি হতেন না তিনি। 'আমি তো ভাবতেই পারছি না, অনন্যা আমার ! আমার মেয়ে !'

'কিন্তু তোমার ছেলে বলছ কেন ! যতদূর জানি তোমার দ্বিতীয় স্ত্রীও তো...'

কথা শেষ করতে দেন না সুপ্তিকে, আবুল হাসান বলেন, 'না। ওরও কোনো সন্তান হয়নি।'

'তাহলে ?'

'এক এতিমখানা থেকে নিয়েছি।' আবুল হাসান বলেন, 'পিতৃপরিচয় নেই। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। দেবে না সুপ্তি, তোমার মেয়েকে পিতৃ-পরিচয়হীন ছেলেটার হাতে তুলে দেবে না ?'

এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে ভেজা দু চোখে দিশেহারার মতো তাকান সুপ্তি। 'এ তো তোমারও মেয়ে। তুমি যা ভালো বুঝবে, ভাববে, তা-ই হবে।'

অনন্যার কাছে তখনো সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। অন্তহীন খুশিতে সে বলে, 'মা, ও মা, সব সত্যি তো,

বলো না ! সত্যি তো !'

'সত্যি রে মা, সত্যি।' সুপ্তি বলেন, 'একটুও মিথ্যে নয় রে।'

নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে এক পা দু পা করে এগিয়ে এসে এই প্রথম পুতুলের মতো মেয়ে অনন্যা আবুল হাসানের একটা হাত ধরে অস্ফুট বলে, 'বাবা !'